
বনশিকারী

ব ন্য শি কা রী

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৬৪

প্রকাশক :
সৌরেন্দ্র নাথ পাল
৫৯, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
সরোজকুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২সি শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

ব্লক :
সরকার প্রসেস ওয়ার্কস
৫৭।২ পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

বাঁধাই :
ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স
২০, কেশব সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রচ্ছদ :
নির্মল ঘোষ

দাম : এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

বন্যশিকারী

অনুবাদঃ

প্রসূন বসু

সঞ্চারী

৫৯, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯



হাওয়ার্ড ফাস্টের THE TALL HUNTER

গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ



এই লেখকের

টনির স্বপ্ন

পিন্টুমাষ্টার



এক

আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা। সকলের ছোট ছেলে। নাম ছিলো রিচার্ড হ্যামণ্ড। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। ঠিক বুনো লতার মতো। দুটি উজ্জ্বল চোখ। শান দেওয়া ছুরির মতো।

সব সময় তাঁর পরনে থাকত একটি লম্বা আঁটা পাজামা। সেই অবস্থায় কতো পথ যে তিনি পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়েছেন!

হতাশায় দীর্ঘ-নিশ্বাস তিনি ফেলতেন কম। হাসতেন বেশি। অদ্ভুত হাসি। হো হো শব্দে। আশে পাশের

লোক জমে যেত। কিন্তু মজা হলো তাঁর সঙ্গে তারাও হাসতে শুরু করত।

তিনি ছিলেন মানুষের ভালো করার মতোনই একজন মানুষ। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। প্রশস্ত বুক। বলিষ্ঠ দেহ। কুস্তি লড়ে কেউ কোনদিন পেরে ওঠেনি তাঁর সঙ্গে।

পাঁচ ভাই তাঁরা। তিনিই সবচেয়ে ছোট। কেউ কেউ বলতো, সবচেয়ে সুন্দর। তখনকার দিনে সবই ছিলো কেমন কেমন! একসঙ্গে পাঁচ ভাই থাকা বিস্ময়ের কিছু নয়।

সেই তখনকার দিনে, মানে আজ থেকে দেড়শ বছর আগে অধিকাংশ মানুষই ছিলো অন্যরকম। আমাদের এদেশ মানে, আমেরিকার বয়সও ছিলো তখন কম। গগণচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ হতো কম। চাষবাসই হতো বেশি। গাছ পোঁতা হতো কম। কাটা হতো বেশি। তখনকার দিনের মানুষেরা তিন বেলা পেট পুরে খেতো। আর তারপর মাথায় টোকা গুঁজে কাজে বেরিয়ে যেত।

তখনকার দিনে পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হতো বড় ছেলে। সম্পত্তি যদি বেশি থাকত তাহলে বড় ভাই ছোট ভাইদের ডেকে বলত, "বিয়ে থাওয়া করে এইখানেই থেকে যা। খাওয়া পরার তো আর কোন অভাব নেই।"

কেউ কেউ রাজী হতো। আবার কেউ কেউ হতো না। হবেই বা কেন! তাদের মন ভরা ছিলো গর্ব। বুক ভরা বল। চোখের সামনে ঘন জঙ্গল। তিন হাজার মাইল বিস্তৃত এক সীমান্ত। যতো দূর চোখ যায় অসীম সেই সীমান্ত ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। সেখানে বাস করে কেবল বন্য

ইণ্ডিয়ান আর বন্য জন্তু। আর কেউ নয়।

বিরাট এ জঙ্গল। ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। কল্পনাও বোধ হয় করা চলে না। সাগরপাড়েই বাস করত অধিকাংশ মানুষ। এ জায়গাটাকে তারা বলত 'স্রোতধারার দেশ।' আগামীকালের মানুষদের জন্য এই বিরাট জঙ্গল গড়ে তুলেছিল এক বিরাট স্বপ্ন।

বছর আঠারো বয়স হবে তখন ঠাকুরদার ঠাকুরদার। অজানা কিসের এক ডাক তাঁর কানে এসে যেন পৌঁছুলো। আমার কিছুই নেই—এই ব'লে ঘরের কোণে বসে বুক চাপড়াবার মতো লোক ছিলেন না তিনি। তিনি জানতেন, প্রাণ ভরে গ্রহণ করার মতো মুক্ত বাতাস তো কেউ কেড়ে নেয়নি। নিজের কাছে নিজেই একদিন তাই বলে উঠলেন, "রিচার্ড আজ থেকে তুমি মুক্ত।"

তাঁর বড় ভাই এডমণ্ড। পুরো মাত্রায় সংসারী। এ-ব্যাপারে তাঁর মন সায় দিতে পারল না। ছোট ভাইকে ডেকে বললেন, "ত্যাখ, ঘরবাড়ি করে একটা বিয়ে থা' কর, তোর জন্যে না হয় পৃথক বাড়িই বানিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া চাষবাস কর। তোকে দশ একর জমি দিচ্ছি।"

দশ একর! ভ্রু কুঁচকে উঠল ঠাকুরদার ঠাকুরদার। সেই হাসি। হো হো শব্দে হেসে উঠলেন। চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে তখন পশ্চিমদিকে। সেই সীমান্ত পানে। দশ হাজার, দশ লক্ষ একর জমি। সবুজে ঢাকা বিরাট বনভূমি অপেক্ষা

করে আছে। কবে, কে তার বুকে বাসা বাঁধবে। সংসার পাতবে।

দশ থেকে বাড়িয়ে বিশ একর জমি দিতে রাজী হলেন এডমণ্ড। কিন্তু, রিচার্ডের হাসি কি আর থামে! কি আর করবেন এডমণ্ড! রেগেমেগে বলে উঠলেন, "তোর মাথায় একেবারে গোবর পোরা। তুই একটা আস্ত গাধা।"

যে সময়ের কথা আমি বলছি, সে সময়টা ছিলো বড় খারাপ। আমাদের মাতৃভূমি ছিলো ইংলণ্ডের রাজা জর্জের অধীনে। অন্য সব রাজার মতো জর্জও ছিলেন একজন বিচক্ষণ লোক। নতুন এক ছুনিয়ায় নতুন এক জাতি তখন গড়ে উঠছে। যে রাজা মানে না, রাজ্য মানে না, রাজ-শাসন মানে না, তাদের সম্পর্কে বড় বেশি চিন্তিত হয়ে উঠেছিল ইংলণ্ড।

ফরাসী আর ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কিছুদিন আগে একটা জোর লড়াই হয়ে গেছে। ফরাসীদের মিত্রশক্তি হিসাবে ইংলণ্ড যোগ দিয়েছিল সেই যুদ্ধে। নিজের চোখে দেখেছে, একটা একটা করে কতো দেশ ফরাসীদের হাতছাড়া হয়ে গেল। স্বাধীনতার সেই চেতনা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম দিকে। ইলংণ্ড শাসিত রাজ্যে। ইণ্ডিয়ানদের দমন করবার প্রচেষ্টা ছেড়ে পাহাড়ের নিচের এই মুক্ত জাতির বিরুদ্ধে ইংলণ্ড তার শক্তি সমাবেশ করল। কিন্তু, মুক্ত জাতি কি আর চুপ করে থাকে? তারাও বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এক নতুন দেশ গড়তে চাইলো।

স্বাধীনতার লড়াইয়ে এক বিরাট মুক্তিবাহিনী গড়ে

উঠেছে। পাহাড়ের পিছনে অবশ্য সেরকম কোন মুক্তিফৌজ গড়ে ওঠেনি। সেখানকার মানুষেরা তাই আর কি করবে! দরজা-জানালা বন্ধ করে, শক্ত মুঠিতে বন্দুক চেপে ধরে আত্ম-রক্ষার প্রচেষ্টা চালাতো!

ঠাকুরদার ঠাকুরদা অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। দরকারও হতো না। ভার্জিনিয়া নামে এক সুন্দর দেশ। দিব্যি আরামে সেখানেই দিন কাটাচ্ছেন তিনি। ফুর্তিতে আর আনন্দে দিন কাটাবার মতো কোন কিছুর অভাব ছিলো না ভার্জিনিয়ায়। যা মন চায় তাই করো। খুশি হয় খামোখা হেঁটে বেড়াও। খুশি হয় ঘোড়ায় চড়ো। ম্যাজিক দেখাও। শিকার করো। অভাবও নেই। বাধা দেওয়ারও কেউ নেই।

ঠাকুরদার ঠাকুরদা অবশ্য ভালো বাসতেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে শিকার করতে। সঙ্গে থাকতো একটি শিকারী কুকুর।

এ তো গেল সকালের কথা। সন্ধ্যা হলে তো কথাই নেই। গাঁয়ের সরাইখানায় এসে আড্ডা জমাতেন। বিচিত্র সব মানুষদের কাছ থেকে বিচিত্র গল্প শুনতেন। আজ ভার্জিনিয়ায় সে ধরণের সরাইখানা আর চোখে পড়ে না।

অভাব বলে কোন কথা জানতো না তখনকার মানুষেরা। খুশি মতো হেঁটে চলার মতো হু'খানি পা, খাদ্য সংগ্রহের জন্য একটি বন্দুক, আর শক্তি জোগানোর জন্য শক্ত মন ছাড়া আর কিছুরই দরকার হতো না তাদের। আজকের মতো অতিথিশালা তখন গড়ে ওঠেনি। কিন্তু, আতিথ্য

গড়ে উঠেছিল। সারা সীমান্ত জুড়ে। কোন বাড়ির খোলা জানালা দেখলেই বোঝা যেত, খাওয়া-থাকার মতো জায়গা সেখানে আছে।

সন্ধ্যাবেলায় যে সরাইখানায় আড্ডা জমতো তার পিছনের দিকে ছিলো একটা মস্ত বড় উঠোন। সেখানে চৌকো মতন একটা তক্তা পুঁতে তার গায়ে গুলি ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা করা হতো। ঠিক যেরকমভাবে আজ হাতের টিক ঠিক করা হয়।

গুলি ছোঁড়ার এক অদ্ভুত গর্ব ছিলো ভার্জিনিয়ার মানুষদের। পেনিসেলভেনিয়ায় বানানো এক অদ্ভুত রকমের বন্দুক ব্যবহার করত তারা। বন্দুকের গুলিও ছিলো ছোট। একটু স্বতন্ত্র। ছোট্ট একটা ডেলার মতো।

কোনদিন কোন আগন্তুক যদি সেখানে আসতেন, আর সূর্যের শেষ রশ্মিটি অবশিষ্ট থাকতো, তাহলে গুলি ছোঁড়ার প্রতিযোগিতার জন্য তাঁকে তারা আহ্বান করত।

চৌকো সেই তক্তার মধ্যিখানে একটা গোল টিনের চাকতি লাগিয়ে দেওয়া হতো। প্রায় ষাট হাত দূর থেকে টিক করে সেই চাকতিটাতেই গুলি লাগাতে হবে। ব্যাপারটা যতো সহজ মনে হচ্ছে ততো সহজ নয় কিন্তু। অতো দূর থেকে ছোট্ট একটা চাকতিকে টিক করে গুলি ছোঁড়া বেশ মরদের দরকার। আগন্তুক যদি ঠিক মতো গুলি লাগাতে পারতেন তাহলে তাঁর সম্মানে সারা রাত ধরে উৎসব চলতো। খাওয়া-দাওয়া হৈ-হুল্লোড়! কৃতিত্বই ছিলো তাদের কাছে জীবনের সবচেয়ে পবিত্র জিনিস।

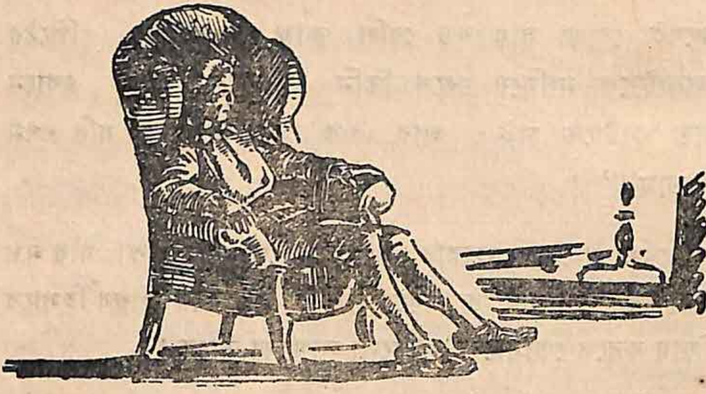
একদিন সন্ধ্যাবেলা। খোসমেজাজে সরাইখানায় আড্ডা জমিয়ে তুলেছেন ঠাকুরদার ঠাকুরদা। ধেনো মদের গন্ধে বাতাস মাতাল। এমন সময় এক আগন্তুক এসে হাজির। দেখেই বোঝা যায় বড় বেশি ক্লান্ত ভদ্রলোক। পিঠের বোঝাটাকে নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, "আমি এখানে রাত কাটাতে চাই। আর, এক কাপ গরম চা যদি এখন পেতাম।"

বেশ খাটো চেহারার মানুষ। দেখেই বোঝা যায় নম্র স্বভাবের। গায়ের রং দিয়ে বিচার না করে মানুষ হিসাবে বিচার করলে তোমাদেরও ভালো লাগতো তাঁকে।

হরিণের মতো ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। বেড়ালের মতো আস্তে আস্তে পা ফেলে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালেন একটু। হাঁটবার সময় পায়ের পেশি-গুলো ঠিক সাপের মতো লাগছিল। চোখজোড়া উজ্জ্বল। সততার ছাপ পরিষ্কার। সোজাসুজিভাবেই তিনি সকলের দিকে তাকাতে পারেন। সে যে কেউই হোক না কেন! তাঁর চোখের রং ঠিক সন্ধ্যার আকাশের মতো নীল।

চা এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে। পরম আরামে গরম চায়ের কাপে চুমুক লাগালেন ভদ্রলোক। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পা দুটোকে ছড়িয়ে দিলেন একটু। এ-আরাম যেন কতো-দিন উপভোগ করা হয়নি। এরকম একখানা ভাব। সকলের উৎসুক দৃষ্টি তাঁর দিকে। চুপচাপ বসে রইলেন আগন্তুক। কোন কথা বললেন না। বেশি কথা বলা তাঁর

স্বভাবের বাইরে। তারাও তাঁকে আর বিরক্ত করল না। তাদেরও কাউকে বিরক্ত করা অভ্যাস নয়।



দিনের আলো তখনও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। গুলি ছোঁড়ার প্রতিযোগিতার জন্য দু' একজন সাহস করে এগিয়ে এসে প্রস্তাব করল। যে হারবে তাকে গাঁ্যাট থেকে টাকা খরচ করতে হবে, সবাইকে খাওয়াবার জন্য। এক-জন তো আবার অত্যুৎসাহী হয়ে প্রস্তাব করে বসল, আগন্তুক ইচ্ছে করলে আমার হাতের তেলো টিক করে গুলি ছুঁড়তে পারেন। গুলি ছোঁড়ার সে এক পরম ভক্ত। কোন মানুষকে ইচ্ছে করে বিপদে ফেলা, বা ঠকাবার মনোবৃত্তি কিছুই তাদের ছিলো না। তারা বলল, "এটা একেবারে বন্ধুর মতনই।"

"বন্দুক ছোঁড়া একেবারে ছেড়েই দিয়েছি বলতে গেলে।" আগন্তুক জবাব দেন। তখন তাঁর চোখের পাতা ঘুমে ভেঙ্গে আসছে।

"আমাদের প্রতিযোগিতাটা অবশ্য একটু কঠিন আছে।" আস্তে আস্তে তারা আবার বলল।

"ঠিক আছে, একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক।" ঠোঁটে হাসির রেখা টেনে বলেন আগন্তুক।

আগন্তুক ভদ্রলোক ধীরে ধীরে উঠোনের দিকে এগিয়ে চলেন। তাঁর সাথে সাথে চলে সবাই। সরাইখানার মালিক, পরিচারিকা সকলেই। কাঠের তক্তার বুকে টিনের চাকতিটা লাগিয়ে দেয় তারা।

দিনের আলো তখন ম্লান হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা আগত। অস্তগামী সূর্যের রঙীন আভায় লাল হয়ে উঠেছে ভার্জিনিয়ার সবুজ গাছের পাতা আর কালো মাটি। কে যেন একমুঠো আবির ছড়িয়ে দিয়েছে।

দূর থেকে ভাল করে তখন চাকতিটা দেখা যাচ্ছিল না। একজন প্রস্তাব করল, আগন্তুককেই আগে গুলি ছুঁড়তে দেওয়া হোক। ভদ্রলোক কিন্তু আপত্তি করলেন, "না না এসব কি বলেন!"

কিছুক্ষণ থেমে ভদ্রলোক আবার কথা বলেন, "জানেন, আপনাদের বন্দুক ছোঁড়াটাই আমি দেখতে চাই। নিজের হাতে বন্দুক ছোঁড়ার চেয়ে, অপরের গুলি ছোঁড়া বেশি ভাল লাগে। নাচ গান দেখার মতো এটাও বেশ আনন্দের ব্যাপার। তাছাড়া, আপনাদের বন্দুকগুলো ভারি সুন্দর। ঠিক রাজ হাঁসের গলার মতো।"

কথা কি করে বলতে হয় তা বেশ ভাল ভাবেই জানা ছিল ভদ্রলোকের। তাঁর কথাবার্তায় সবাই একেবারে মুগ্ধ।

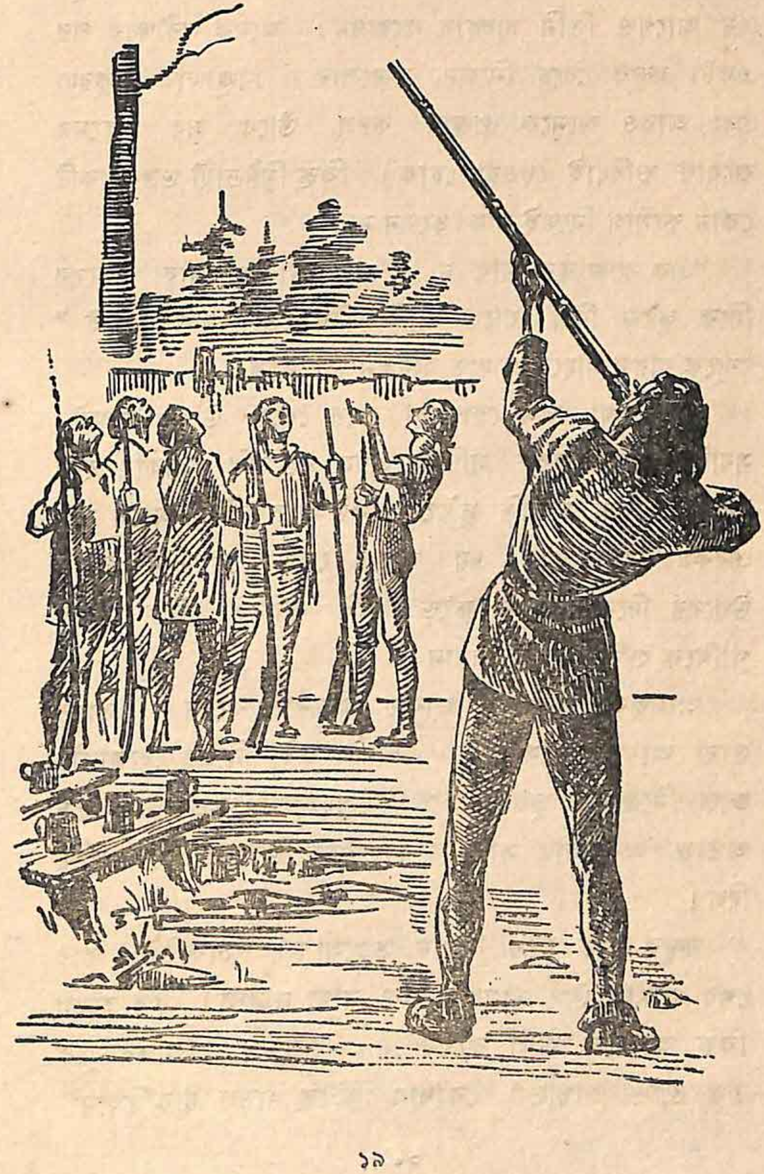
মনে মনে সব ভাবতে থাকে, এতো ভাল যিনি কথা বলতে পারেন, না জানি কতো ভাল তিনি গুলি ছুঁড়তে পারেন।

প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি শুরু হয়। কেউ বন্দুক নাড়াচাড়া করে, কেউ বা বারুদ গাদে, কেউ নল পরিষ্কার করে, আবার কেউ বা দেখে বারুদগুলো মিইয়ে গেছে কিনা—এক কথায় সবাই কর্মব্যস্ত। তাদের কাজকর্ম দেখলে যে কেউই বিশ্বাস করত যে অনেক পারদর্শী ইংরাজ সৈন্যের চেয়ে তাদের পারদর্শিতা অনেক বেশি। কেউ কেউ সঠিক গুলি করল, আবার কারুর কারুর ফসকিয়েও গেল। তবে, মোটমাট বেশ ভালই গুলি ছুঁড়ল তারা। আমার দৃঢ় ধারণা ওরকম গুলি ছোঁড়ার খবর পেলে তোমরাও গিয়ে সব জড়ো হতে।

ঠাকুরদার ঠাকুরদা ঠিকমতো গুলি করলেন। তাঁর মতো আরও অনেকে করল। অনেক চাকতি নষ্ট হলো। বিনিময়ে তারা অবশ্য পেল তাদের কৃতিত্বের গর্ব।

আগন্তুকের পালা আসতে আসতে পুরোমাত্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। চাকতিটাকে একেবারে দেখাই যায় না বলতে গেলে। তারা ভাবতে লাগল, এতো অসুবিধার মধ্যে আগন্তুক কি আর রাজী হবেন? কেউ কেউ আবার ভাবল এর জন্যেই বোধ হয় তিনি ইচ্ছে করে দেরী করেছেন, পরে ছুঁড়তে চেয়েছেন।

তারা যখন এসব ভাবছে, আগন্তুক তখন নিজের মনে একটার পর একটা বন্দুক পরীক্ষা করে চলেছেন। একটা একটা করে ধরছেন, রাখছেন, ঠিকমতো যেন পছন্দই হচ্ছে না। সবাইয়ের চোখ ছিলো আগন্তুকের দিকেই। তারা



বুঝতে পারল, পেনিসেলভেনিয়ার এ বিশেষ ধরণের বন্দুক এর আগেও তিনি ব্যবহার করেছেন। অনেক পরীক্ষার পর একটা বন্দুক বেছে নিলেন ভদ্রলোক। ঠাকুরদার ঠাকুরদা এবং আরও অনেকে প্রস্তাব করল, তাঁকে সব রকমের সুযোগ সুবিধাই দেওয়া হোক। কিন্তু মিষ্টভাষী ভদ্রলোকটি কোন সুযোগ নিতেই রাজী হলেন না।

"এক কাজ করা যাক না! চাকতিটা আপনারা উপরের দিকে ছুঁড়ে দিন, যাতে আমি ঠিকমতো দেখতে পাই।" বন্দুকে বারুদ গাদতে গাদতে বললেন ভদ্রলোক।

তাঁর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল সবাই। সবাই স্বীকার করল, সত্যিই এখন বড়বেশি অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু চাকতি ছুঁড়তে কেউ আর এগিয়ে আসে না। এরকম কথা তো এর আগে কেউ শোনেনি বাবা! উপরের দিকে চাকতি ছুঁড়ে গুলি করাতো ঠিক উড়ন্ত পাখিকে গুলি করারই সমান।

আগন্তুক ভদ্রলোক আবার অনুরোধ করেন। তাতে তারা আবার হেসে ওঠে। ভাবটা এই, নিজের বোকামীর জন্যে নিজেকেই ভুগতে হবে। শেষকালে একজন উঠে এসে অত্যন্ত অবহেলার সাথে চাকতিটাকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিল।

বন্দুক ঠিক করে নিলেন ভদ্রলোক। চাকতিটা তার শেষ সীমায় উঠে নামবার জন্য মাথা নামাল। এর আগে কিন্তু আগন্তুক গুলি করেন নি। গুড়ুম! চাকতির বুকে এক প্রচণ্ড আঘাত। কোথায় ছিট্‌কে পড়ল চাকতিখানা

সবাই তখন ছুটে গিয়ে দেখল চাকতির বুকে মস্তবড় একটা ছ্যাঁদা করে গুলি বেরিয়ে গেছে।

আগেই বলেছি, কৃতিত্বের চেয়ে কিছু বড় ছিল না ভার্জিনিয়ার মানুষদের কাছে। সবাই ঘিরে ধরল ভদ্রলোককে, দুই হাত তুলে সম্বর্ধনা জানাতে লাগল, তাঁর ক্ষমতার গুণগান করতে লাগল। তাদের সম্বর্ধনার বহর দেখে আগন্তুক সত্যিই লজ্জা পেয়ে গেলেন। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি টেনে তিনি তখন জানালেন, তাঁর নাম হলো ডেনিয়েল বুন।

এমনি ভাবেই আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা ডেনিয়েল বুনের সান্নিধ্যে এলেন। তাঁর সাথে গভীর বনে যাত্রা করলেন। আর তাঁর ছেলের জন্য, তাঁর ছেলের জন্য, তাঁর নাতির জন্য, মানে আমাদের পরিবারের জন্য রেখে গেলেন জনি আপেল সীডের কাছে এক কঠিন ঋণ।

আজও আমি আপেল খাওয়ার সময় কিছু বীজ বাঁচিয়ে রাখি। আমার বাবাও ঠিক একই কাজ করতেন। তাঁর বাবা, আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা সবাই এ কাজ করেছেন। চৈত্রের শেষে কিংবা বৈশাখের প্রথমে আমি সে বীজগুলো ছড়িয়ে দিই।

তা বলে বাড়িতে নয় কিন্তু। বাড়িতে তো অনেক গাছই আছে। এখানে ওখানে সেখানে যেখানেই যাই না কেন খুশিমতো ছড়িয়ে দিই। আমাদের পরিবার এক জায়গায় বেশিদিন তো আর থাকেনি কোনদিন। এখানে সেখানে

ঘুরে বেড়িয়েছে। আর, সব জায়গাতেই আমরা আপেল বীজ ছড়িয়ে দিয়েছি। আমি আমার পাশের পকেট ছুটোতো বীজে ভর্তি করে রাখি। তাহলে, বুনতে বড় সুবিধা হয়।

এ কাজটা মোটেই কঠিন নয়। ইচ্ছে করলে তোমরাও করতে পারো। খুব ভালভাবে না করলেও মোটামুটি অল্প কষ্ট করেই একাজ করা চলে। ব্যাপারটা কিছুই নয়। আগে খানিকটা মাটি কুপিয়ে নাও। তারপর বীজগুলো ছড়িয়ে দাও। এবার বীজের ওপর মাটি চাপা দিয়ে দাও। কোন বীজ হয়তো অঙ্কুরিত হবে আবার কোনটা হয়তো হবে না। কিন্তু, গাছ জন্মালেই বুঝবে এটি জনি আপেল সীডেরই দান। তোমরা হয়তো বলবে, বা! তা কেন?

আজকাল অধিকাংশ লোক অবশ্য জনি আপেলসীড সম্পর্কে কিছুই জানে না, জানতে চায়ও না। গভীর অরণ্যের মাঝে নোংরা মাটির বুকে কোন আপেলগাছ দেখতে পেলে তারা একবারটিও ভেবে দেখে না, এখানে আপেলগাছ এলো কোত্থেকে!

আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা কিন্তু সেকথা জানতেন। জানবেন না কেন! তাঁর মাথায় যে ছিলো ঋণের বোঝা। খুব সহজ ঋণ। কোন সুদ দিতে হয় না। শোধ করাও যায় না। সেজন্যে অনেকে তাকে ঋণ বলে ভাবে না। শোধ করার কথা চিন্তাও করে না।

জনি আপেলসীড সম্পর্কে, বা আমাদের পরিবার কি করে তাঁর কাছে ঋণী হলো, সেসব গল্প পরে করা যাবে।

ঠাকুরদার ঠাকুরদা আর ডেনিয়েল বুন সম্পর্কে এখনও অনেক কথা বাকী রয়ে গেছে।

বড় বড় গাছ। আর তার মাঝেই বুনের ঘর বাড়ি। বনের পশু পাখির সাথে কথা বলতে পারতেন বুন। তাঁর মনে ছিলো না কোন হিংসা। মনভরা ছিলো বিস্ময়, আর অজানাকে জানবার প্রচণ্ড আগ্রহ। বুন যেন একজন মাষ্টার আর সারা ছুনিয়াটা তাঁর ক্লাশরুম। আর পড়াবার বিষয়? এই সীমান্ত। বন্দুক ছোঁড়ায় এতো পারদর্শী হয়েও তাঁর গুলির মুখে কোনদিন কোন মানুষকে প্রাণ দিতে হয় নি। পরে অবশ্য কিছুলোক তাঁর এই পবিত্র নামের পিছনে একটি কলঙ্কের চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। আস্ত একটা জিনিসকে ভেঙ্গে ছুটুকরো করা তাঁর জীবনের ধর্ম ছিলো না। তাঁর জীবনের ধর্ম ছিলো বরং উল্টো। ভাঙা ছুটুকরোকে এক করা। প্রতিটি সাদা চামড়ার মানুষ তাঁকে বন্ধু মনে করত, প্রতিটি লাল চামড়ার মানুষ তাঁর শক্তি আর সাহসের তারিফ করত।

সরাইখানায় সেই রাতে বুনের মহত্ব সম্পর্কে, বা তাঁর সাহস সম্পর্কে কেউই কিছু বুঝতে পারল না। তারা শুধু একথাই বুঝল, তিনি খুব ভাল গুলি ছুঁড়তে পারেন।

মাটির হাঁড়িতে উনুনের ওপর টগবগ করে মদ ফুটছিল। তার বিশ্রী গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। লম্বা একটা টেবিলে সবাই বসেছিলেন। বুন আর ভার্জিনিয়ার মানুষরা। সারা রাত ধরে গল্প চলল। সুমিষ্ট কণ্ঠে বুন

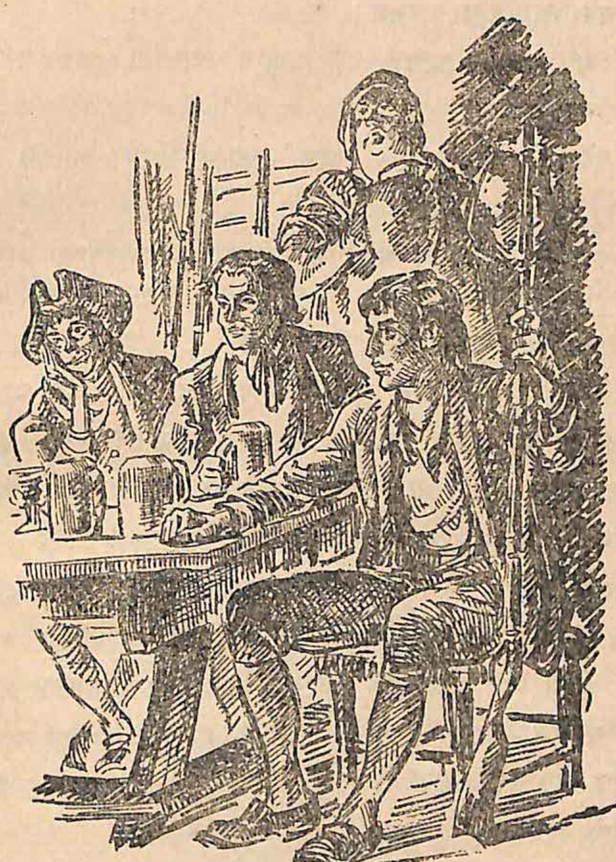
বলে চলেন, পাহাড়ের পিছনের গভীর বনে বন্যদের সব অদ্ভুত অদ্ভুত রোমাঞ্চকর গল্প। বন্যরা সব শিকার করতে আসে সেই গহন বনে। লম্বা ঘাস আর বেতবনে ভরা সে জায়গা। বনের গাছ কেটে আর গাছের গুঁড়ি বইয়ে সেখানে মাজা বাঁকিয়ে দিতে হয় না। কালো নরম মাটি চাষের জন্য প্রীতক্ষা করে আছে। সেখানকার ঘাসের রং আকাশের মতো নীল। সকাল-সন্ধ্যায় পাখিরা উড়ে এসে পেটপুরে মধু খায়। ঘরের ইঁদুরের মতো হরিণরা মুক্তভাবে এখানে সেখানে চলাফেরা করে। খেয়ে খেয়ে ভালুকগুলো এতো মোটাসোঁটা হয়ে ওঠে যে গাছে তারা চড়তে পারে না।

"তা সে জায়গাটার নামটা কি?" সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে ওঠে।

"কেন্টাক্" বুন ধীরে ধীরে জবাব দেন। কথাটির পুনরাবৃত্তি করে তিনি আবার বলেন, "কেন্টাক্! ইণ্ডিয়ানরা অবশ্য তার আলাদা নাম দিয়েছে। তারা তাকে বলে, 'রক্তচোষা দেশ'।"

বুন তাদের কাছে তখন কেন্টাকের গল্প বলে চলেন। সুদূরের সেই নির্জন দেশ। যার বুকভরা মহান সম্পদ। সে বন থেকে শিকার করে ফিরে আসলে কেউ আর নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেয় না। মানুষ হয়ে কি আর সেখানে শিকার করতে যাওয়া যায়! কোন ইণ্ডিয়ানও পর্যন্ত সেখানে বাস করে না। ইণ্ডিয়ানরা অবশ্য মাঝে মাঝে শিকার করতে আসে। প্রাণখুলে শিকার করে

নিয়ে যায়। "আমার সঙ্গে সেদেশে যাওয়ার জন্যে আমি কিছু লোক খুঁজছি।" বুন বলেন "বেশ কিছু সাহসী



শক্তিশালী ছেলেমেয়ে। সেখানে যাওয়ার নতুন পথ আমি আবিষ্কার করেছি। সে পথ ধরে যাওয়ার জন্যেই কিছু লোক আমার দরকার। পাহাড় ডিঙ্গিয়ে সেই নতুন

২

দেশে পৌঁছে নতুন করে তারা বাড়ি ঘরদোর গড়ে তুলবে।"

"তা আপনার এই দুর্গম পথ কোথায় শেষ হয়েছে?" একজন জিজ্ঞেস করে বসল।

"লম্বা সেই বেতের বনে আর অজানা অন্ধকারে।" বুন জবাব দিলেন।

"ইশ! প্রাণ হাতে করে এভাবে গিয়ে লাভটা কি শুনি?" আর একজন প্রশ্ন করে।

"এমন আরামের ঘরবাড়ি ছেড়ে ওরকম বিপদ মাথায় করে কেউ যাবে কেন? মানুষ আর পশুর মধ্যে তো সেখানে কোন তফাৎ নেই বুঝতে পারছি।" আবার প্রশ্ন।

বুন বলেন, "সে যদি একলা হয়, তার যদি অ্যাডভেঞ্চারের মন থাকে, ঘোরার নেশা থাকে, সাথে বন্দুক ছাড়া আর কোন সঙ্গী না থাকে; তবে তার লাভ যতো ছোটই হোক না কেন, সে খুশিমতো গ্রহণ করতে পারবে। তার নিজের চোখে এমন সব জিনিস সে দেখতে পাবে, কোন সাদা চামড়ার মানুষ যা জীবনে দেখেনি। নিজের পায়ে সে এখন সব জায়গায় হাঁটবে কোন সাদা চামড়ার মানুষ যা জীবনে কল্পনা করেনি। সে হবে একজন মুক্ত মানুষ। হাতে যতক্ষণ বন্দুক আছে ততক্ষণ তার পেটের চিন্তা করতে হবে না।"

একটু থামেন বুন। তারপর আবার বলে চলেন, "আর তার যদি কোন পরিবার থাকে তবে তো কথাই নেই। যাতে খুশি তাতে সে তার পুরস্কার মেপে নিতে পারবে। মন দিয়ে চাষবাস করলে ফসল সে ঘরে তুলে

পারবে না। বাস করার জন্যে সে নির্মাণ করবে মনের মতন সুন্দর বাড়ি। সুন্দর সুন্দর হরিণের চামড়ায় সে তার ঘরের বেড়া ঢেকে দেবে। যতোদূর দৃষ্টি চলে সেই উর্বর জমির সেই হবে একমাত্র মালিক। তার লাঙ্গলের ফলার সাথে উঠে আসবে থোকা থোকা উজ্জ্বল সোনা।"

"কোন বিপদ নেই সেখানে?"

"বিপদ তো আছেই। বিপদ সম্পর্কে কোন রহস্যের সৃষ্টি আমি করতে চাই না। বিপদের কথা তো আমি আগেই বলেছি। সাধে কি রেড ইণ্ডিয়ানরা তার নাম দিয়েছে 'রক্তচোষা দেশ'! তার কালো মাটির সাথে কতো যে লাল রক্ত মিশে আছে, তার কি ঠিকঠিকানা আছে? কিন্তু, কথা হলো, এখানকার মানুষরাও কি বিপদ মুক্ত?" বুন এবার থামেন।

কেউ কেউ হেসে উঠল তাঁর কথা শুনে। অন্যেরা আবার বলে উঠল, "দরকার নেই বাবা! তারচে' ভার্জিনিয়ায় বসে বসে বুদ্ধিতে শান দেওয়া অনেক ভাল।"

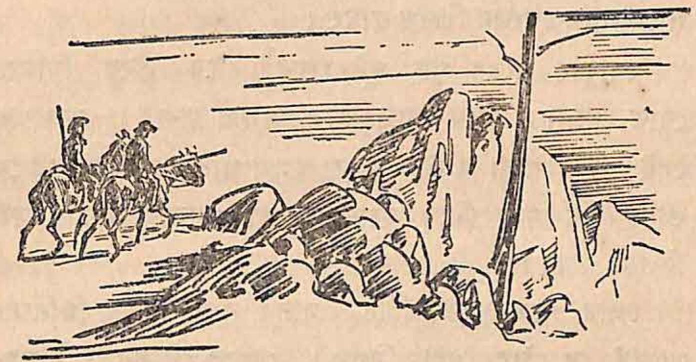
"হ্যাঁ, অনেকেই তো একথা বলবে!" মৃদু হাসতে হাসতে বলেন বুন। তাঁর কথার মাঝে অবশ্য কোন শ্লেষ ছিলো না। তবে, তাঁর উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ম্লান হয়ে এলো।

কিছুক্ষণ থেমে ব্যথিতকণ্ঠে বুন বলে চলেন, "সেরকম লোকদের আগুন পোয়াবার জন্যে তো জ্বলন্ত চুল্লী অপেক্ষা করে আছে। তাদের আমার কোন দরকারে লাগবে না। আমার কথা বলতে হলে অবশ্য আমি বলতে পারি, ঘরের

মধ্যে আরামের বিছানায় ঘুমোতে আমি বেশ লজ্জা বোধ করি। রাতে শোয়ার পর গাছের শন্‌শন্‌ শব্দ ভেসে আসবে না, নেকড়ের কোন ডাক শোনা যাবে না, এসব আমি কল্পনাই করতে পারি না। পাহাড়ের ওপাশে কি আছে সে কথা জানার জন্যে আমার মন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। সেই কারণেই সে পথ ধরে এগিয়ে চলি। আমি অবশ্য আমার সাথে যাওয়ার জন্যে কাউকে জোর করতে চাইনে। সেটা একান্তই তার ব্যক্তিগত ইচ্ছে।"

গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বুনের কথা শুনে গেছেন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা। একটি কথাও বলেন নি। তাঁর চোখের তারা দুটো হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল। মুখের ওপর কিসের ছাপ ভেসে উঠল। এ ছাপের অর্থ তখনকার লোকরা বুঝত। বুনও বুঝতে পারলেন। একটু মৃদু হাসলেন শুধু।

এ ছাপ হলো পরিভ্রমণের ছাপ। অজানার পথে পাড়ি দেওয়ার ছাপ। দুর্গম গভীর অরণ্য আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা রিচার্ড হ্যামণ্ডকে আহ্বান জানিয়েছে।



দুই

পরদিন সকালে ডেনিয়েল বুনের সাথে রওনা হলেন রিচার্ড হ্যামণ্ড। সঙ্গে নিলেন তাঁর সম্পত্তি বলতে যা ছিল—বন্দুক, বারুদের ভাঁড়, কাঁধের ঝোলা, পরনের জামা-কাপড়। আর সাথে করে নিয়ে চললেন তাঁর সেই প্রিয় ঘোড়া আর ভার্জিনিয়ার দীর্ঘকালের স্মৃতি।

তাঁর যাত্রার উদ্যোগ দেখে বড় ভাইরা তো এসে হাজির। বলেন "তুই একটা এক নম্বরের বোকা, বুঝলি? আর ঐ বোকার পথেই চলেছিস্। ঐ বুনের কথায় তুমি চলেছ। ঐ ব্যাটাচ্ছেলেই তোমাকে বশ করেছে।"

হয়তো তাই সত্যি। বোকার পথেই তিনি চলেছিলেন। কিন্তু বোকার পথে গিয়েও সময় সময় এমন ফল পাওয়া

যায়, কোন চালাক লোক যা জীবনে কল্পনা করতে পারে না।

পাহাড়ের গা ঘেঁসে ঘন বন-ভূমি পিছনে ফেলে বুনের সাথে সাথে চললেন রিচার্ড হ্যামণ্ড।

ঘোড়ার খুরের খুট্ খুট্ শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। কান খাঁড়া করে থাকল সবাই। যতোক্ষণ সেই শব্দ শোনা যায়। কতো জঙ্গল পরিষ্কার করে করে যে তাঁকে পথ করে নিতে হয়েছিল, তা গোনার মতো কেউ ছিল না তখন।

চলার পথে কতো বিচিত্র মানুষ, কতো বিচিত্র জিনিসের সাথেই যে তাঁর দেখা মিলল! দেখতে পেলেন পেনিসেল-ভেনিয়ার ছই ঢাকা বড় বড় গরুর গাড়ী, গরু—ভেড়া মহিষের পাল, আর দূর দূরান্তর থেকে হেঁটে আসা বিচিত্র বিচিত্র মানুষ—তাদের মধ্যে রয়েছে বলিষ্ঠ মেয়ে, পুরুষ সুন্দর সুন্দর ছেলে মেয়ে, বুড়ো বুড়ী। সবাই চলেছে সেই গভীর জঙ্গল পানে, সেই নির্জন স্থানে—কেন্টাকে। সবাই সেই উর্বর মাটির স্বপ্ন দেখছে, সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখছে, সোনালী ফসলের স্বপ্ন দেখছে।

কিন্তু আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার তো পরিবারের কোন বালাই ছিলো না, আর সাথে কোন মেয়েছেলেও ছিলো না। বাউণ্ডুলে জীবন। দুর্গম অরণ্য তাঁকে ডাক পাঠিয়েছে। আর তিনি ভবঘুরে হয়েছেন। অদ্ভুত জীবন! মাইলের পর মাইল পথ হাঁটতে কোন কষ্ট নেই, মাথা গুঁজবার মতো কোন আস্তানার দরকার নেই, আর জীবনে সঙ্গীরও

প্রয়োজন নেই কোন। যতো গভীর জঙ্গলই হোক না কেন, পথ তিনি হারান নি কোনদিন। হারাবেন কি করে! বুনো হাঁসের মতো পথ চেনার যে তাঁর ক্ষমতা ছিলো।

তাঁর মতো তখন অনেকেই ছিলো। শিকারী, বাউণ্ডুলে, ভবঘুরে, গৃহহারা,—সবার গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে গেছে, সবাই নিজের হাতে শিকার করে এনে সেঁকে সেই মাংস খায়। অজানাকে তারা আয়ত্বে আনত। সবসময় জানতে চাইতো, পাহাড়ের ওপাশে কি আছে, নদীর ওধারটা কিরকম। অজানাকে জানবার আগ্রহ।

বুনকেও অবশ্য তাদের মধ্যে ধরা চলে। তবে বুন ছিলেন তাদের চেয়ে একটু বড়। বুনের সাথে তাদের একটু তফাৎ ছিলো—বুন ভবিষ্যতের জন্যে একটু চিন্তা করতে পারতেন, নিজের জন্য না হলেও অন্ততঃ পরের জন্য। চোখ বন্ধ করলে তাঁর চোখের সামনে এমন একটা সময় ভেসে উঠতো, যখন এ বন্যতা আর বন্যতা নেই। তিনি দেখতে পেতেন আজ যাদের শিকার করে করে জীবন কাটাতে হয়, সেদিন তাদের আর শিকার করতে হয় না। তাদের শিকার করার প্রয়োজন সেদিন গেছে ফুরিয়ে, এই গভীর বন-জঙ্গল হয়ে উঠেছে শস্যশ্যামলা ক্ষেতভূমি। কোন ছল-চাতুরী না করে তাদের ঘরে ঘরে বশ মেনে রয়েছে এই সব হরিণের পাল, আর মহিষের দল।

যা ঘটে তার চেয়ে তিনি অনেক বেশি দেখতে পেতেন। তিনি জানতেন, সভ্য জগতে এই ভবঘুরে আর বাউণ্ডুলেদের কোন স্থান থাকবে না।

বুন তাই বিয়ে থাওয়া করে ঘর-সংসার পাতলেন, ছেলে-পিলে হলো, হাতে লাঙল ধরলেন, উর্বর মাটি খুঁড়ে সোনার মতো মুঠি মুঠি শস্য তুলে আনলেন। তিনি জানতেন কি কড়া শাসন এই বন্যতার। তিনি ঐ শাসন মানতে চান না—একজন মুক্ত মানুষ হ'তে চান। তিনি দাসে পরিণত হ'তে চান না, এমনকি বন্যতার কাছেও—যে বন্যতা এত-জনকে একেবারে দাসে পরিণত করেছে। বাউণ্ডুলে জীবনের এই অর্থহীন য়্যাডভেঞ্চারের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর জীবনটাকে নষ্ট করে দিতে চান না। অনেকে একদিন তাঁকেই যে কথা বলেছিল, একদিন রিচার্ড হ্যামণ্ডকে ডেকে তিনি সেই কথাই বললেন, "রিচার্ড, আজ আর তুমি আঠারো বছরের কচি খোকা নও। এইবার একটা বিয়েথা' করে ঘর-সংসার করো।"

কিন্তু, আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার কানে কি আর এই উপদেশ ঢোকে! এ জীবন তো তাঁর কাছে ঠিক খাঁচায় বন্দী হওয়া জীবনের মতো।

"মাথা গুঁজবার আস্তানা সে তো পায়ে শিকল পরবার মতো!" হাসতে লাগলেন রিচার্ড, "খড়ের এই পালঙ্কের বিছানা কি গাছের পাতার বিছানার চেয়ে নরম?"

"প্রত্যেক জিনিসেরই একটা মূল্য আছে এটা তুমি বোঝ? খুশিমতো নাচ গান করো আপত্তি নেই। কিন্তু বাজিয়েকে পয়সা দিতে হবে, এটা মনে থাকে যেন! একদিকে চেয়ে দেখো—ফাঁকা। কিছু নেই। আর অন্যদিকে? সুখ,

আনন্দ—আর শেষ বয়সে কোলের উপর নাতি-নাতনি-দাদুর আনন্দের দান!" বলেন বুন।

"আমি মুক্তমানুষ।" গজ-গজ করে ওঠেন রিচার্ড, "মেয়েছেলে দিয়ে আমি কি করব? আর আমার মতো একটা বাউণ্ডুলেকে বিয়ে করেও বা সে মেয়েছেলে সুখী হবে কি করে?"

সবই বুঝতে পারলেন বুন। একটু হাসলেন শুধু। ভাবলেন, একদিন তিনিও এই কথা বলতেন। তিনি জানতেন, মেয়ে আর পুরুষ, প্রকৃতি আর পুরুষ, এ সম্পর্ক চিরদিনের, চিরকালের।

আর এদিকে রিচার্ড হ্যামণ্ড আবার ফিরে চললেন, তাঁর সেই বন্য জীবনে। শিকার করা, যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানো, জীবন হাতে করে ইণ্ডিয়ানদের সাথে ছলচাতুরী খেলা, বিরাট বিরাট হরিণ আর হোঁৎকা হোঁৎকা শূয়োর শিকার করা—মুক্ত মানুষের জীবন যাপন করা।

এদিকে তো একটি মেয়ে কেন্টাকে বুনদের পাড়ায় এসে আস্তানা গাড়ল। বহুদূরের সেই মেরিল্যাণ্ড থেকে বাবার সাথে সে এসেছে এই দেশে। সুন্দর লম্বা ছিপছিপে একটি মেয়ে। নাম এলেন মে। কঠোরতা আর কোমলতা, তেজ আর স্নেহ যেন মিশে আছে একসাথে। অদ্ভুত গুণ। সব জায়গাকেই সে আপন করে নিতে পারে। সে যতো বাজেই হোক, যতো সুন্দরই হোক। সে এই গভীর বনজঙ্গলই হোক, শহরই হোক, আর অজ পাড়া-গাঁ হোক, সব কিছুকেই আপন করে নেওয়ার তার অদ্ভুত ক্ষমতা।

বুনের বাড়ি থেকে একটু তফাতে আস্তানা গাড়ল তারা। আর তার বাবা ভবিষ্যতের একটা চিন্তা করতে লাগলেন, কিভাবে এখানে জীবনটা কাটান যায়।

তার বাবা ছিলেন একেবারে খাঁটি চাষী। ধর্মে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। পাড়া প্রতিবেশির প্রতি অদ্ভুত ভালবাসা, আর শিক্ষক ও হাতে কাজ জানা লোকের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। তাঁর দু' চোখের বিষ ছিলো এই ভবঘুরে শিকারীরা। তাদের তিনি একদম দেখতে পারতেন না।

এদিকে এলেন মে যখন তার বাবার সাথে সুন্দর ঘর সংসার গুছিয়ে নিচ্ছে, রিচার্ড হ্যামণ্ড তখন একটার পর একটা গভীর জঙ্গল পাড়ি দিচ্ছেন। হাজার মাইল পথ বোধহয় তিনি পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিয়েছেন। তোমরা খুব নিশ্চিত থাকতে পারো যে তাঁর মতো হাঁটিয়ে আজ আর একজনও মেলে না।

তিনি দৌড়ে বোধ হয় হরিণের সাথে পাল্লা দিতে পারতেন। আর তাঁর সাথে ছুটে নেকড়েকে পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠতে হতো।

হরিণের চামড়া দিয়ে এক অদ্ভুত রকমের জুতো বানাতে পারতেন তিনি। সেই জুতো পায়ে হাজার হাজার মাইল পথ অক্লেশে হেঁটে চলতেন। সীমান্ত দেখে তিনি তাঁর পথ ঠিক করতেন। মাইল দেখে পথ মাপতেন না, মাপতেন ইণ্ডিয়ানদের পিছু পিছু তাঁকে কতো পা এগিয়ে যেতে হয়েছে। সে সময় পশ্চিম সীমান্তে কোন রাস্তা-ঘাট ছিলো না। বিক্ষিপ্ত ভাবে বন-জঙ্গল তছ্‌নছ্‌ করে

হাজার হাজার বছর ধরে ইণ্ডিয়ানরা যেদিক দিয়ে যাতায়াত করেছে, সেইটেই এক মাত্র পথ।

যারা কেবল খুশি মতো ঘুরে বেড়ায়, সব সময় জানতে চায় পাহাড়ের ওধারটা কি রকম, নদীর ওপাড়ে কি আছে, তাদের একটা মূল্য দিতে হবে বৈকি! তবে, আজকালকার মতো নয়। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার সময়ে সে মূল্য ছিলো বড় বেশি। অজস্র মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল—লাল চামড়া, সাদা চামড়ার সবাই। কিন্তু তাদের কি আর রিচার্ড হ্যামণ্ড পরোয়া করেন! তাঁর সামনে কেউ রুখে দাঁড়ালে তাকে আঘাত করে এগিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিল।



তিনি লড়াই করেছেন অনেক। আর শত্রুকে হটিয়েও দিয়েছেন সব সময়। চিতা বাঘের মত তাঁর হাঁটবার

ক্ষমতা ছিলো, হরিণের মতো ছিলেন দ্রুত, নেকড়ের মতো হঠাৎ আক্রমণ করতে পারতেন, আবার ভালুকের মতো ছিলো শরীরে প্রচণ্ড শক্তি। দিনে দিনে ঠিক শেয়ালের মতো তিনি চালাক হয়ে উঠেছিলেন। রাতের অন্ধকারে পেঁচা যেমন পথ চিনে নিতে পারে, পায়ের ছাপ দেখে সেরকম ঠিক পথ চিনে নিতে পারতেন তিনি। রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছে তিনি তো একটি ভীতিপ্রদ জীব হয়ে উঠেছিলেন ; তাঁর সাথে ছল-চাতুরী করার আগে তাদের বেশ ভেবে নিতে হতো।

এটা ছিলো বাঁচার জন্য প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা অবশ্য এই সংগ্রামে বেশ আনন্দ পেতেন। তবে দিনে দিনে যে তাঁর মনটা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারেননি একেবারে। তিনি অনুভবই করতে পারেননি দিনে দিনে তিনি কতো কঠোর, কতো নিষ্ঠুর হয়ে উঠছেন।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি কুইবেক আর মনট্রিলের প্রাচীন শহরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে ফরাসী আর স্কচ-ম্যানদের সাথে চামড়ার ব্যবসা করলেন। তখনকার দিনে যেকোন লোক চামড়ার ব্যবসা করে ভাগ্য ফিরিয়ে নিতে পারত। মাত্র তিরিশ টাকার বিনিময়ে ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে গাড়ী গাড়ী চামড়া কেনা যেত। একটা রূপোর টাকার বিনিময়ে সুন্দর একটা শিয়ালের চামড়া মিলত,

একটা লোহার ছুরী দিলে বিরাট এক ভালুকের চামড়া পাওয়া যেত।

সেই তখনকার দিনে অনেকেই এইভাবে তাদের ভবিষ্যত গড়ে নিয়েছে! অনেক বাউণ্ডুলে তাদের বাউণ্ডুলে-জীবন ছেড়ে শহরে এসে বিরাট বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, দাস-দাসীর পরিচর্যায় সুখে আনন্দে পরবর্তী জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। আর বাকী কিছু লোক কোন কাজ না করেই একেবারে রাজা ব'নে গিয়েছে। তারা শিকারও করত না, বনে বনে ঘুরেও বেড়াত না, কেবল কম দামে চামড়া কিনেছে, আর বেশি দামে বিক্রী করেছে। অগাধ লাভ। দিনে দিনে তারা হয়ে উঠেছে এক একজন রাজা, অগাধ সম্পত্তির অধিকারী।

আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার ওসব ভবিষ্যতের দিকে কোন নজর ছিলো না। তাঁর কথা ছিলো—আছে খরচ করো, নেই করো না, এসো—চলে যাও, নাচো, গান করো, ফুর্তিতে জীবন কাটাও। পরিণতি কি হবে সে সব নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো তাঁর অবসর ছিলো না। অর্থ তাঁর কাছে হাতের ময়লা—মেজাজমাফিক খরচ করো। একবার শিকারে বের হলে তিনি যতোগুলো শিকার করে আনতেন, অন্য কেউ তা পারতো না। চামড়া খুলে বিক্রী করতেন, কতো দাম-টাম ও নিয়ে অতো মাথা ঘামাতেন না।

"আমাকে ঠকাবে? ঠকাও। মনে থাকে যেন তোমাকে নিজেকেও তাহলে একদিন ঠকতে হবে।" এই কথাটাই তিনি বারবার বলতেন।

ফরাসীরা তাঁর সম্পর্কে বলত, "হ্যাণ্ডসাম! অদ্ভুত শিকারী ছেলে। কিন্তু তার মগজ একেবারে ফাঁকা। মোমবাতির মতো নিজেকেই নিজে সে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।"

তারা কিন্তু ভুল বুঝেছিলো। নির্বুদ্ধিতা বলে তারা যাকে ধরেছিল, তা হলো তাঁর জীবনের প্রতি উদগ্র ভালবাসা।

উত্তর দিক ছেড়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কিছুদিন ঘুরে বেড়ালেন রিচার্ড। অনেক জায়গাই তিনি এর আগে কোনদিন দেখেননি। অনেক অজানাকেই বশে আনলেন। তারপর বেশ কয়েক বছর ঘোরাফেরা করে, বিচিত্র জীবন যাপন করে আবার ফিরে এলেন কেন্টাকে।

চোখে মুখে গর্বের হাসি নিয়ে তিনি বুনের পাশে এসে বসলেন। পাড়ার সব বুড়োরা এসে জমলো তাঁর কাছে। গল্প শুনতে। দেশ বিদেশের গল্প। তখন তো আর আজকের মতো সুযোগ ছিলো না। কেন্টাক থেকে নিউ-ইয়র্ক বা বোষ্টনে যাওয়া খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটতো।

বেশ কয়েকদিন আরামে কাটিয়ে, ঘরের রান্না খেয়ে আর পাতা বিছানায় ঘুমিয়ে ফিরবার উদ্যোগ করলেন রিচার্ড। গাছের তলায় সবুজ ঘাসের ওপর না ঘুমুলে কি তাঁর ভাল লাগে। রাত্রিবেলা শিশুর হাসির চেয়ে তাঁর ভাল লাগে নেকড়ের ডাক শুনতে, তাতেই তিনি আনন্দ পান। বুন বললেন, "এবার নিজের সম্পর্কে একটু চিন্তা করো রিচার্ড। নিজের হাতে চাষবাস করো—সোনার ফসল ফলাও। প্রত্যেকেরই কোন না কোন জায়গায় আস্তানা

গড়া উচিত। রান্না ভাত খাওয়ার মধ্যে অনেক আনন্দ আছে। বুঝলে?"

"আগুনে সেঁকে কাঁচা মাংস যখন খেতে পাই, তখন কেন তোমার ঐ রাঁধা ভাত খেতে যাবো বলো!" জবাব দেন রিচার্ড।

"তুমি একটু চিন্তা করো।" বুন আবার অনুরোধ করেন, "আমি তোমার বন্ধু রিচার্ড। সেই সুন্দর দেশ থেকে তোমাকে আমি সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। তোমাকে এরকম বন্য শিকারী বানাবার ইচ্ছে আমার কোনদিন ছিলো না।"

বুনের কথায় সায় দিতে পারলেন না রিচার্ড। কি করে দেবেন? ভবঘুরের মতো ঘুরে না বেড়ালে তিনি বাঁচবেন কি করে?

তিনি ফিরে যাবেনই, কেউ তাঁকে ধরে রাখতে পারবে না। চুল্লীর পাশে বসে ঠাণ্ডা বারুদগুলোকে একবার ভাল করে সেঁকে তাজা করে নিলেন, বন্দুকটাকে পরিষ্কার করে নিলেন, হরিণের চামড়ার জামাটা গায়ে গলিয়ে নিলেন, ছোট্ট ব্যাগে ভরে নিলেন টুকিটাকি সব জিনিসপত্র। তারপর পিছনে ব্যাগটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন রিচার্ড। ঠিক এমনি সময়ে তাঁর চোখে পড়ল এলেন মে-কে।

দেখতে পেলেন, এক কাপড়ের দোকানে কাপড় কিনতে এসেছে এলেন। এসে অবধি তার অবসর নেই! গোছগাছ করতেই সময় কেটে যায়। নিজে তাঁত চালাতে পারে,

কাপড় বুনতে পারে। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি। তাই কিছু কাপড় কিনতে এসেছে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন রিচার্ড। তাঁর চোখ গিয়ে পড়েছে তার নিটোল হাতের সেই ছোট্ট ঝাঁকিটার ওপর। বিস্ময়ে কিরকম যেন হতবাক হয়ে যান রিচার্ড। ফিরে যাওয়ার সমস্ত চিন্তা যেন নিমিষের মধ্যে উড়ে যায় মাথা থেকে।

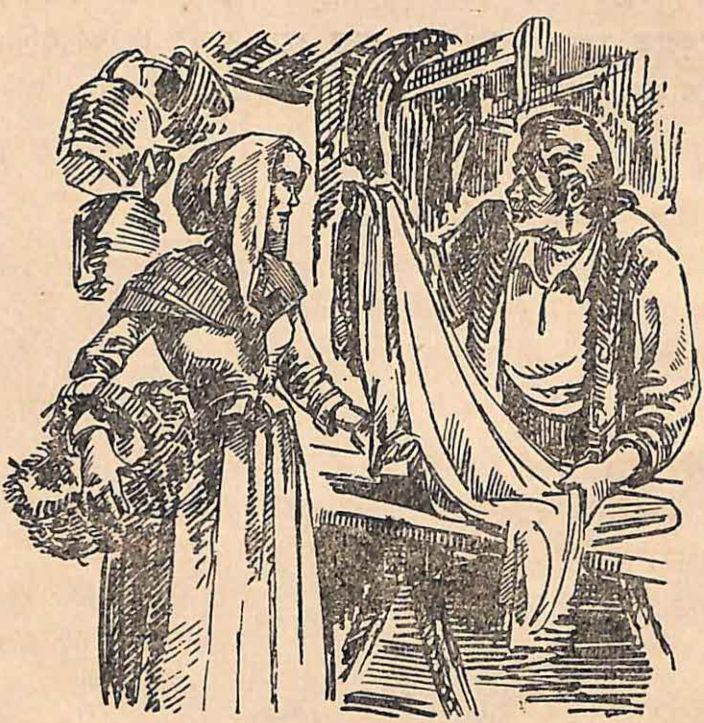
দীর্ঘসময় ধরে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আর তাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। সারা চোখের দৃষ্টি তার সেই সোনালী কেশগুচ্ছের ওপর। মাঝে মাঝে দুই জোড়া নীল চোখে দৃষ্টি বিনিময়ও হয়ে গেল। বিভিন্ন দেশে তিনি ঘুরেছেন, উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম বাদ দেননি কোনদিকেই, বিভিন্ন জাতের সাথে মিশেছেন, বিচিত্র ধরণের মেয়ে দেখেছেন, কিন্তু এলেন মে-র মতো এতো শক্ত, এতো সুন্দর মেয়ে আর তিনি দেখেন নি কোনদিন।

একটা মেয়ে যে নিমিষের মধ্যে তাঁর হৃদয়কে জয় করে নিতে পারে, এ আর তিনি দেখেননি কোনদিন। তিনি নিজে অনেকের হৃদয় জয় করেছেন—কিন্তু তাঁর হৃদয় জয় করতে পারেনি কেউ কোনদিন।

এলেনেরও তাঁকে চোখে পড়েছে। তাঁর মতো ওরকমের লম্বা-চওড়া পুরুষকে যে কোন মেয়েরই চোখে পড়ে। এলেন ফিরে গেলেও পাথরের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন রিচার্ড। তাঁর চোখের কোণে ভেসে উঠলো যেন এক নতুন দৃষ্টি—কেউ কোনদিন এ দৃষ্টি দেখেনি। ঠোঁটের

কোণায় ভেসে উঠলো মৃদু মৃদু হাসি ; ঠিক জ্যোৎস্না রাতে উপচে পড়া চাঁদের হাসির মতো।

বুনের কাছে আবার ফিরে এলেন রিচার্ড। লম্বা বন্দুকটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, "ঘুরতে ঘুরতে আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কয়েকদিন তোমার এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে যাই ডেনিয়েল।"



তিন

ভার্জিনিয়ার ছেলেদের যে এক বিশেষ সৌন্দর্য থাকে তা এতোদিন বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে হারিয়ে ফেলেছিলেন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা।

খারাপ ভালো সব রকমের মানুষের সাথেই তিনি মিশেছেন। তিনি শিকার করেছেন, হত্যা করেছেন, এবং দিনে দিনে কঠোর হয়ে উঠেছেন। ঘরে বসে থালায় করে খাবার খাওয়ার চেয়ে আগুনে সেঁকে কাঁচা মাংস খেতেই অভ্যস্ত হয়েছেন। সিল্কের জামা কাপড়ের চেয়ে চামড়ার জামা কাপড়ই তাঁর কাছে বেশি আরামপ্রদ হয়ে উঠেছে।

লাল চামড়ার মানুষদের তিনি শত্রু বানিয়েছেন। খুব কম সাদা চামড়ার মানুষই তাঁকে বন্ধু ভাবত। তাঁর এই অস্বাভাবিক জীবনের পথে যেই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকেই আঘাত করে তিনি এগিয়ে গেছেন। বিশ্রাম তিনি জীবনে চান নি, আর পানও নি।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এলেন মে ছাড়া আর কোন মেয়েই তাঁর চোখে পড়েনি।

আট মাস কাটালেন তিনি বুনের বাড়িতে। খাঁচায় ভরা সিংহের মতো কেবল গজ গজ করতে লাগলেন, অস্থির হয়ে উঠলেন, চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন কেবল একটি মাত্র কাজের জন্য—সে কাজে তাঁকে সফল হতেই হবে। মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে বন্দুকটাকে তিনি হাতে তুলে নিতেন, "না না, আমি ফিরে যাবো। এ সব ভুলে যাবো।" কিন্তু, যেতেন না কোনদিন।

আট মাসের মধ্যে চার মাস তো এমনিই কেটে গেল। এলেন মে-কে ভালবাসেন, এই কথাটাই তিনি বলতে পারলেন না।

প্রথম দিকে খুব কমই তাঁর সাথে দেখা করতে পারতেন

তিনি। অস্থির হয়ে কখনো বনে পায়চারি করতেন, কখনো বা সবুজ ক্ষেতের মাঝে ঘুরে বেড়াতেন। আবার কখন বা চুপচাপ হাত গুটিয়ে বাড়িতে বসে থাকতেন। প্রথম দিকে তার সাথে একেবারে কথাই বলতে পারতেন না তিনি। সে তাঁকে একেবারে বোবা বানিয়ে দিয়েছিল। তাকে দেখতে পেলেই পাথরের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়তেন।

কিন্তু, তার দিক থেকেই বা করার কি আছে। সে কেবল দেখত এই লম্বা চওড়া মানুষটি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তাঁর মতো লম্বা চওড়া মানুষ খুব কমই দেখা যায়। কেন্টাকের লোকেরা সাধারণতঃ একটু লম্বা চওড়া হতো। কিন্তু, তিনি আবার তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে যেতেন। এখানকার লোকেরা রোদ্দুরে পুড়ে মাঠে কাজ করলে কি হবে, তাদের সবার চেয়ে তাঁর গায়ের রং ছিলো লাল। ঠিক অনেকটা রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো। তাদের চেয়ে তাঁর চোখহুটো ছিলো অনেক বেশি উজ্জ্বল।

একদিন রিচার্ড দেখতে পেলেন যে বাঁকে করে কুয়োয় জল আনতে যাচ্ছে এলেন। বাঁকে করে এলেনকে কিছু জল তুলে দেওয়ার এই সুযোগ তিনি ছাড়লেন না। বললেন, "আপনার মতো মেয়ের পক্ষে এটা বড় বেশি বোঝা।"

"বোঝা কোথায় দেখলেন?" হাসল এলেন, "কলসী করে জল আনা এ তো একটা সামান্য কাজ। বারোবছর বয়েস থেকে এই কাজ আমি করছি।"

"এখন কিন্তু একাজ বন্ধ করার আপনার সময় এসেছে।" হঠাৎ বলে ফেললেন রিচার্ড।

তার হাত থেকে কলসী ছুটো নিয়ে নিলেন রিচার্ড। বাঁকে ভালো করে বেঁধে নিলেন কলসীছুটোকে। তারপর এক ঝাঁকুনিতে ভরে নিলেন কলসীছুটি, তুলে নিলেন নিজের কাঁধে।



"আপনার গায়ে সত্যিই জোর আছে," সে স্বীকার করল।

তার হাসিঝরা চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি কিন্তু একেবারে ছোট্ট শিশুর মতো দুর্বল এবং বোকা ব'নে গিয়েছেন। এর পর থেকে তার সাথে তাদের বাড়ি পর্যন্ত বাঁকে করে জল তুলে দেওয়া তিনি তাঁর পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন।

কোন রকমে তার সাথে ঘোরাফেরা করার মতো সাহস তিনি মনের মাঝে নিয়ে এসেছেন! চিতাবাঘের মতো আগে যিনি চালাক ছিলেন, তিনি এখন একেবারে একটা বোকা ছেলে হ'য়ে গিয়েছেন। তাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় বোকার মতো টুপিটাকে হাতে নিয়ে তিনি বললেন, "আচ্ছা, আমি তাহলে এখন যাই। একদিন আপনাদের বাড়ি যাব। আপনাদের বাড়ি গেলে কিছু মনে করবেন না নিশ্চয়।"

এতোগুলো ভদ্র কথা বলতে তাঁর প্রাণ একেবারে বেরিয়ে গেছে। কথা শেষ করে তার দিকে তিনি তাকিয়ে থাকেন সে কি বলে। সে কিন্তু বলে না কিছু। কেবল খুশিমনে হাসে। কেবল মাথা নাড়ে, সম্প্রীতি জানায়। ভাবখানা যেন, এতে আর এমন কি আছে! "এতে অখুশি হওয়ার কি আছে।" সে বলে "কেন্টাকে এসে বড়ো নির্জনেই আমার দিন কাটছে। নির্জনতা কাটানোর চেয়ে একজন মেয়ের কাছে সৌভাগ্যের আর কি আছে?"

"আপনি আর কিছু চান না? এখানকার মানুষগুলো সব এক একটা বোবা, অন্ধ।" বলেন রিচার্ড।

"সব অন্ধ মানে?"

"অন্ধের চেয়েও অধম। চোখ থাকলে তারা এ দেশের সবচেয়ে সুন্দর জিনিসটাকে দেখতে পায় না!"

এর পর থেকে প্রায়ই তিনি তাদের বাড়ি আসতে লাগলেন। নিত্য নতুন নতুন মাংস—হরিণ, শূয়োর, পাখি সাথে করে আনতে লাগলেন। মাঝে মাঝে আবার সেই মাংসের রান্নাও খেয়ে যেতে লাগলেন।

যতোবার তিনি টমাস মের বাড়ি আসতেন, ততোবার নতুন করে চুল্লী ধরানো হত। নতুন নতুন রান্না হতো, একটা সুখের আমেজ বয়ে যেত। টমাস মে আর তার মেয়ে ঘরের চুল্লীর পাশে বসে বসে রিচার্ড হ্যামণ্ডের বিচিত্র বিচিত্র গল্প শুনতেন, আর অবাক হয়ে যেতেন। তাঁরা বরাবরই সংসারী লোক। এসব অভিজ্ঞতা তাঁদের কিছুই নেই। আর এদিকে রিচার্ড হ্যামণ্ডের তো ঠিক উল্টো—খুব অল্প দেশই আছে যা তাঁর পায়ের স্পর্শে ধন্য হয় নি।

তাদের কাছে তিনি সিয়াস্কদের গল্প বললেন। কোন লোক খুব জোর কদমেও যদি হাঁটে, তবুও সে দেশে পৌঁছাতে তার কমপক্ষে একমাস লাগবে। দু হাজার মাইল উত্তরের সেই সব বাঁকাচোখো মানুষদের গল্প, অন্ধকার রাজ্যের সেই সব উলঙ্গ মানুষদের কথা, এক ইংরেজ মহা পুরুষের নেতৃত্বে যে সব মক্‌রা লড়াই চালিয়েছিলো তাদের কথা বলে আসর জমিয়ে রাখতেন তিনি। মাঝে মাঝে

ফরাসী আর ক্যানাডিয়ানদের মুখ থেকে শোনা সেইসব বন্য-মানুষদের গল্পও তিনি বলতেন তাদের। সে দেশে যাওয়ার সৌভাগ্য অবশ্য তাঁর ঘটেনি কোনদিন।

আমার খুব সন্দেহ আছে, সারা আমেরিকায় তখন রিচার্ড হ্যামণ্ডের মতো এমন কোন লোক ছিলো কিনা, যে তাঁর বেশি বন-জঙ্গলের কথা জানত।

"তা আপনার তখন নির্জন ঠেকত না?" এলেন মে জিজ্ঞেস করত।

"হ্যাঁ, নির্জন ঠেকত বৈকি।"

"কোন মানুষের বাড়িতে আপনি কোনদিন রাত কাটাননি? চুল্লীর ধারে ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে কোনদিন ঘুমোন নি?"

"তখন অবশ্য কিছুই করিনি। তবে, এখন আর ওরকম জীবন ভাল লাগে না।"

টমাস মে-র মনে কি ছিলো কে জানে। তিনি বোধ হয় ভাবছিলেন এই লম্বা-চওড়া মানুষটি, যে এতো বিচিত্র দেশ আর বিচিত্র জীবন জানে, তার মেয়ের সঙ্গে সুন্দর মানাবে। মেয়ের কাছে তিনি যদি এই কথা বলতেন, তাহলে সে বোধ হয় একটু হাসতো। তার বাবার চেয়ে রিচার্ড হ্যামণ্ডকে সে অনেক বেশি জানে।

সে রিচার্ডকে ভালবাসত। সে ভাবত, কিন্তু তিনি কি সত্যিই তাকে ভালবাসেন। তাকে কেন, কোন মেয়েকেই কি তাঁর মতো মানুষ ভালবাসতে পারে। এক এক সময়

সে ভাবত, তিনি গভীর অরণ্যকেই প্রকৃত ভালবাসেন। অরণ্যচারীর জীবন ছেড়ে দিয়ে তাঁকে নিয়ে ঘর-সংসার পাতানো সম্ভব নয়।

একদিন হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা আর এলেন যে নদীর ধারে উঁচু একটা ঢিবির উপর পৌঁছলেন। ঢিবির উপর থেকে চোখে পড়ে গভীর অরণ্য, ঘন বেত-বন, আর কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে নদী।

গাছের পাতার ফাঁক গলিয়ে সূর্যের উজ্জ্বল আলো এসে ঠিকরে পড়েছে তাদের ওপর। রিচার্ড হ্যামণ্ড এলেনকে বলেই ফেললেন যে তিনি তাকে ভালবাসেন। এর আগে হাজার চেষ্টা করেও এই কথাটা তাঁর মুখ দিয়ে বের হয় নি। কিন্তু, এখন কতো অনায়াসে, ঠিক পাখির গানের মতো, তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো সহজ সরল এই কথাটি।

"আমিও অপেক্ষা করছিলাম।" গলা আটকে গেল এলেনের। চোখের কোণায় জল এসে পড়ল, ঠোঁটের কোণে ভেসে উঠল এক ঝিলিক হাসি, "অনেক দিন ধরে আমি অপেক্ষা করেছি। ভাবছিলাম, ভবঘুরের জীবন কাটিয়ে তুমি বোধ হয় এই কথাটা ভুলে গেছ রিচার্ড। আমার ধারণা ছিলো, তোমার কাছ থেকে কোনদিন বোধ হয় এমন কথা শুনতে পাবো না।"

"সেই প্রথম যেদিন তোমাকে দেখলাম," রিচার্ড বললেন, "আমার চোখের সামনে আর কোন মেয়ের মুখ ভেসে ওঠেনি। মাঝে মাঝে আমার পা উস্‌খুস করে উঠেছে।

আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, আমি আমার কাঁধের বন্দুক নামিয়ে রাখব, নতুন অভিযানের কথা ভুলে যাবো। আমাকে বিশ্বাস কর এলেন, আমি একেবারে পাল্টে গেছি। আমি একজন শিকারী ছিলাম ভাবতে গেলেই আমার মন ব্যথায় ভরে ওঠে। আজ আমি বুঝতে পেরেছি, নির্জন অরণ্য-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো একটা বোকামী ছাড়া কিছু নয়।"

"মেয়েদের খুশি করার মতো মন তোমার নেই।" দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়ে এলেন।

"তোমাকে কথা দিচ্ছি এলেন, প্রাণ দিয়ে আমি তোমায় খুশি করব। এবার থেকে আমার পরনে উঠবে তাঁতের কাপড়, পায়ে উঠবে সুন্দর জুতো।"

"কিন্তু তাঁতে বোনা কাপড়ের সাথে পশুর চামড়ার যে তফাৎ তা তুমি সহ্য করতে পারবে? রাতে বনে যখন পশুর ডাক শুনতে পাবে তখন তোমার মন আন্‌চান্ করে উঠবে না? আমাকে ছেড়ে তুমি নিশ্চয় তখন শিকারে বেরিয়ে পড়বে।"

"তোমাকে আমি কিছুতেই ছেড়ে যাব না এলেন," জোর গলায় বলেন রিচার্ড, "আমার বন্দুককে আমি নামিয়ে রেখেছি। এবার হাতে আমি লাঙল তুলে নেব। ভব-ঘুরের মতো যে ঘুরে বেড়ায় সে একটা গাধা—তোমাকে তো আগে আমি বলেছি। কেন, সে কথা কি এখন আমি বুঝি না?"

মাথা নাড়ে এলেন। রিচার্ড বুঝতে পারেন এ বাধা

কিছুই নয়। এলেন তাঁর কাছে অনেক আগেই এসে গেছে। নিজের চেয়ে সে তাঁকে অনেক বেশি বিশ্বাস করে।

দুশো মাইল দূর থেকে ঘোড়ায় চেপে এলেন এক পাদ্রী সায়েব। তাঁদের বিয়ে দিতে। এরকমের পাদ্রী সায়েবদের তখন হামেশাই চোখে পড়ত। এক হাতে জ্ঞানের প্রদীপ—বই। আর অন্য হাতে মারণাস্ত্র—রাইফেল। যুদ্ধ অথবা শান্তি। যখন যা দরকার। প্রয়োজন মতো শান্ত, নম্র। আবার প্রয়োজন মতো ভীষণ, কঠিন।

একমাত্র মেয়ে টমাসের। বেশ জাঁক-জমকের আয়োজন। বিরাট ভোজ। দূর দূরান্তর থেকে নিমন্ত্রিতরা এলো। একশ মাইল, এমন কি দু'শো মাইল দূর থেকেও। পুরুষেরা সবাই চিনতো রিচার্ডকে—বুনের বন্ধু রিচার্ড।

মাংসই ছিলো তখনকার দিনের লৌকিকতা। কেউই তবু মাংস আনল না। এটা তো দেওয়ার ব্যাপার নয়, নেওয়ার। আনন্দের ভোজ। শোকের নয়।

রিচার্ডের হাতে উঠল আবার সেই লম্বা রাইফেল। বনের পশু-পাখিরা ছুটোছুটি, কিচিরমিচির শুরু করল। কিভাবে রিচার্ডের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। সকলেই বুঝতে পেরেছে মাংসের খোঁজে বেরিয়েছে রিচার্ড। কিন্তু, সময় মতো সকলে কি আর পালাতে পারে? পালাতে যারা অক্ষম হলো, অসহায় ভাবে তাদের প্রাণ দিতে হলো রিচার্ডের হাতে। ইয়া চওড়া কাঁধ। একটার

পর একটা শিকার ফেলে বাড়ি ফিরতে লাগলেন রিচার্ড। টমাস মের কাছে এসে বলতে লাগলেন, "এই নিন আর একটা। ব্যাটারা বুঝে নিক কিরকম গিন্নী আসছে আমার।"

দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মুখে মুখে এই উৎসবের কথা ঘুরে বেড়াল। এতো আয়োজন, এতো সমাগম, কেউ আর দেখেনি কোনদিন। হরিণ আর ভালুকের মাংস আগুনে পুড়িয়ে কতো রকমের খাবার তৈরী হলো। তাদের চর্বি জ্বালিয়ে বানানো হলো অদ্ভুত ধরণের পায়স। বাড়িতে তৈরী করা হলো নতুন রকমের মদ। এরকমের মদ কেউ দেখেনি আগে।

বন ঘেঁটে সংগ্রহ করা হয়েছে রং বেরংয়ের বাদাম, মাখনের মতো হলুদরঙা চাল। হাতে বানানো রুটি, সিদ্ধ ডিম আর তাতে টাট্‌কা মাখন—কি সুস্বাদু খাবার হয় ভেবে দেখতো!

সারারাত ধরে নাচের মহড়া চললো। কেন্‌টাকের শিকারীদের মতো নাচিয়ে তখন খুব কমই ছিলো। এই নাচের ব্যাপার নিয়ে কতো রকমের যে গল্প চললো। শোনা যায়, শয়তান দৈত্য স্বয়ং নাকি উৎসবে এসেছিলো। নাচের আসরে যোগ দিয়ে পণ্ড করে দিতে চেয়েছিলো এমন আনন্দ উৎসবকে। কিন্তু, বেচারাকে পণ্ডশ্রম করে একেবারে নাজেহাল হতে হয়েছিলো। শেয়ানা শয়তানটা ভেবেছিলো, নতুন ধরনের নাচ দেখিয়ে ব্যাটাদের দেখিয়ে দেব, নাচ বলতে কি বোঝা যায়।

"এক তুই তিন। ঠিক ঠিক করে নাচুন।" বাজিয়েদের ভারি গলা শোনা যেতে লাগল।

ন্যান্সি লী নামে এক ভদ্রমহিলার সাথে দৈত্যটা তো প্রথম নাচতে গেল। একটানা চোদ্দ ঘণ্টা নাচতে পারতেন ভদ্রমহিলা। তারপর আবার নিয়মিত সংসারের কাজকর্ম করে যেতেন। তাঁর কাছে কুপকাত হয়ে সে ধরল জেনি রেনভলকে, তারপর মেরি ম্যাক্ কিউন। কিন্তু সর্বত্রই এক অবস্থা। কেন্টাকের মেয়েদের কি আর অতো সহজে বিপদে ফেলা যায়। কিন্তু, তাতেও কি ব্যাটা দমে! বাজিয়েদের নাজেহাল করার চেষ্টা করল সে। তাদের ক্লান্ত করতে গিয়ে নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল শয়তান! শোনা যায়, সবাই মিলে তখন তার শিং আর লেজ ধরে টানতে টানতে বনে ফেলে এসেছিল। তারপর থেকে কেন্টাকের মানুষদের পিছনে সে আর লাগে নি।

তাঁদের মতো এরকম দম্পতি খুব কম চোখে পড়ে। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার দিকে তাকিয়ে মেয়েরা ঈর্ষার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। পুরুষরা এলের মে-র সোনাবরন কেশ আর নীলবরন চোখের দিকে তাকিয়ে বলে ফেললেন, "এতো সুন্দর, এতো শক্ত মেয়ে এদেশে আগে আর আসে নি।"

সত্যিই বড় সুন্দর মানিয়েছিলো তাঁদের। তাঁরা এক সাথে মিলে নাচলেন। একবার নয়, তুবার নয়, তিনবার নয়, তিরিশবার। তাঁদের স্তব্ধ করার জন্য শয়তান নিজে তখন বাজনা বাজিয়ে চলেছে। তবুও থামানো যায় না

তাঁদের। শেষকালে সকলে চিৎকার করে উঠলো, "থাক, থাক, এবার একটু নিশ্বাস নাও রিচার্ড।"

তাঁদের বিয়ের পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। মনে হলো, রিচার্ডের বুকের বন্যতার আগুন একেবারে নিভে গেছে। নিভে গেছে ঘরে বৌ আসার পর। একদিনও শিকারে বের হলেন না রিচার্ড, কাঁচা চামড়ার জামা জুতোকে বিদায় দিলেন চিরতরে। তাঁতে বোনা জামাকাপড় উঠল তাঁর গায়ে। সত্যিই এটা তো খুব গর্বের কথা! যার গা থাকতো কাঁচা চামড়া দিয়ে ঢাকা, আজ তার গায়ে উঠেছে ফিনফিনে সিল্কের জামা।

লম্বা বন্দুকটাকে ঘরের বেড়ায় টাঙিয়ে রাখলেন রিচার্ড। সরিয়ে রাখলেন বারুদের পুঁটলিকে। মোকাসিনের জুতোর পরিবর্তে তাঁর পায়ে উঠলো সুন্দর চামড়ার জুতো।

তিনি মাঠ পরিষ্কার করলেন। লাঙ্গল চালিয়ে তুলোর মতো ধুনে ফেললেন কালো মাটিকে। ধান আর আলুর চাষ করলেন। কালো একমুঠো মাটিকে হাতে করেই রিচার্ডের চোখে ভেসে উঠতো কৃষকের স্বপ্ন, ভুলেই যেতেন একদিন তিনি ছিলেন ভবঘুরে, শিকারী।

বন্দুক চালানো তাঁর সেই দক্ষ হাতই হয়ে উঠলো কুঠার আর কোদাল চালাতে দক্ষ। টমাস মে-র বাড়ির পাশেই নিজের জন্য আলাদাভাবে একটা ঘর তৈরী করলেন রিচার্ড। অনেকে বলল, এই বিপদের দিনে ভালো কাঠের দেওয়াল দিয়ে বাড়ি তৈরী করার জন্য। কিন্তু, অবজ্ঞার

হাসি হাসলেন রিচার্ড তাদের কথা শুনে। রিচার্ড হ্যামণ্ডের শক্ত কাঠের দেওয়ালের কি দরকার ?

"আচ্ছা যদি ইণ্ডিয়ানরা আসে ?" এলেন জিজ্ঞেস করল।

"আসুক না !" মৃদু হাসলেন রিচার্ড, "তারাও আমাকে জানে। আর আমিও তাদের জানি। অতো ঢাকাঢাকি দিয়ে বাস করবার কোন দরকার আমার পড়ে নি। ঘা দিলে তাদের দু ঘা খেয়েই যেতে হবে। বরঞ্চ আরও ভালভাবে।"

রাত্রিবেলা জ্বলন্ত চুল্লীর পাশে বসে টমাস মে-র সাথে গল্প করে কাটাতেন রিচার্ড। দিনে দিনে বৃদ্ধ এবং পঙ্গু হয়ে পড়ছিলেন টমাস। বৃদ্ধ হলে কি হবে! এরকম একজন সংসারী ভালো মানুষের সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়ে মনে মনে সুখীই ছিলেন তিনি।

মাঝে মাঝে বন্দুকটাকে পরিষ্কার করে রাখতেন রিচার্ড। দূর দূরান্তর থেকে ভবঘুরের দল মাঝে মাঝে আতিথ্য গ্রহণ করতো তাঁদের। রিচার্ডকে আগে থেকেই তারা সব চেনে। চুল্লী জ্বালিয়ে তাদের পাশে বসে রিচার্ড জিজ্ঞেস করতেন, "আচ্ছা, নর্থল্যাণ্ডের এখন অবস্থা কি ?"

"ভালই বলা চলে। তবে শুনেছি, হুরণরা আবার নাকি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।"

"আমি জানতাম ভাই এসব। শক্ত লোকরা কি আর মেয়েদের মতো ঘরের কোণে বসে থাকে ? আচ্ছা, ওয়ানডট্সদের খবর কি বলতো ?"

"নর্থ কর্কে তারা একটা যুদ্ধে হার খেয়েছে। এখন বসে বসে নিজেদের ঘা শুকোতেই তারা ব্যস্ত।"

"যতোদূর আমার মনে আছে সিডনীদের সাথে তারা সন্ধি করতে চাইছিল। যাক্‌গে ওসব—আচ্ছা বলতো এখন চামড়ার বাজার কেমন ?"

"খুবই ভালো।"

এইভাবেই চললো তাঁর জীবন। ঘরে চুল্লীর পাশে বসে অপরের কাহিনী শুনেই তিনি জীবন কাটাতে লাগলেন। নেকড়ের ডাক শুনতে পেলেই দু'হাতে কান চেপে ধরতেন—কোন রকমে সে ডাক কানে যেন প্রবেশ না করে। ক্যানাডার গভীর বন থেকে উড়ে এসে বুনো রাজ হাঁসের ঝাঁক যদি তাঁর বাড়ির পাশে বসতো, তাহলে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিতেন। কোন রকমে যেন সেদিকে দৃষ্টি না যায়।

ভবঘুরে বাউণ্ডুলে জীবনের কথা এভাবে একজন মানুষ হয়তো ভুলে যেতে পারে। তাই বলে কয়েক মাসে তা সম্ভব নয়। রিচার্ড হ্যামণ্ডের জানা উচিত ছিলো বছরের পর বছরের স্বভাব কয়েক মাস দিয়ে কাটানো সম্ভব নয়।

এমন একটা সময় এলো, রিচার্ড যখন অনুভব করলেন বদ্ধ-ঘর তাঁর জীবনকে যেন দুঃসহ করে তুলেছে। ফাঁদে-পড়া পশুর মতো তিনি বুকের মাঝে একটা ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন। মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে নিশ্বাস নেওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠলো তাঁর মন। বুনো-পথে হাঁটার জন্য আঁকু-পাঁকু করতে লাগল তাঁর পা, কোমল চিবুক

স্পর্শ করতে চাইলো ঠাণ্ডা বাতাসের স্নেহ। নিজের মনে মনেই তিনি বলে উঠলেন: "আমি একটু শিকারে বের হয়ে পা দু'খানা চালু করে নেব। বেশিদূর আর যাব না—কাছেই যাব। দু' একটা হরিণের চামড়া নিয়ে আবার ফিরে অসব।"

এলেনের কাছে একথা বললেন তিনি। চাষী হয়েছেন তাতে কি? সংসারের প্রয়োজনে বন্দুক কাঁধে যখন বাইরে যাওয়ার দরকার, তখন যাবেন না কেন? এলেনের হাত ধরে তিনি বললেন, "দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে আসব। আসার সময় দেখতে পাবে ইয়া বড় এক শূয়োর বা অন্য পশু আমার কাঁধে ঝুলছে। যাক্‌গে ভয় করো না বা আমার জন্যে চিন্তা করো না, বুঝলে? অপেক্ষা করো! কেমন!"

"তোমার জন্যে ছাড়া কি আর কারো জন্যে আমি অপেক্ষা করবো রিচার্ড?" খুশিমনে হাসতে হাসতে এলেন বললো, "আমার ঘরবাড়ি হলো এটা। আর এখানেই অপেক্ষা করার কথা বলা বোকামী নয়?"

সে তো তাঁকে জয় করেছে। তিনি তো এখন একান্ত ভাবে তার নিজের। আর ছ'মাস পরে তো তার কোলে আসবে সন্তান। বউয়ের জন্য দরকার হলে শিকার করতে যাওয়াটা তো স্বাভাবিক। সামান্য সময়ের জন্য তিনি হয়তো যাবেন। কিন্তু ফিরে আসার পর তো সুখে-শান্তিতে থাকা যাবে। সে সুখ তো চিরদিনের, চিরকালের।

শিকারে বেরিয়ে পড়লেন আমার ঠকুরদার ঠাকুরদা।

দেখতে দেখতে প্রায় বারো মাইল তিনি এগিয়ে চললেন তাঁর চোখে পড়ল তিন তিনটে সুন্দর হরিণ। কাঁধ থেকে



বন্দুক নামিয়ে নিলেন। কিন্তু গুলি করলেন না। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠলো এক অতি অদ্ভুত বিস্ময়কর ভাব। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি। কিন্তু গুলি করলেন না কিছুতেই।

গভীর অরণ্যই তো তাঁকে জন্ম দিয়েছে। বনের পশুদের ভালভাবেই চেনেন তিনি। হয়তো হরিণ তিনটি সেই কথাই বুঝতে পেরেছিল। আর রিচার্ড হয়তো পাথরের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন সেই পুরোনো দিনের কথা, যখন তিনি ছিলেন একজন মুক্ত মানুষ, একজন

শিকারী ; একজন ভবঘুরে, তাঁর মনের মাঝে ছিলো শুধু আদিম বন্যতা—তাঁকে বেঁধে রাখার মতো কোন স্ত্রীও ছিলো না তখন।

ধীরে ধীরে নামিয়ে নিলেন তাঁর বন্দুকটাকে। মুখের মাঝে ভেসে উঠলো কঠিন দন্দ্বের ছাপ। একদিকে এলেন আর অন্যদিকে সেই সব পুরোনো দিনের মুক্ত জীবনের স্মৃতি। নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে কি গহন বনে তিনি এসে পড়েছেন!

হ্যাঁ, বন্যতারই পরাজয় ঘটলো শেষকালে। এলেনেরই জয় হোল। তার মুখ ভেসে উঠলো তাঁর চোখের সামনে, তার গলার স্বর তিনি যেন শুনতে পেলেন, তাঁকে ডাকছে। দিন পনেরো পরে বাড়ির দিকে আবার ফিরে চললেন ঠাকুরদার ঠাকুরদা।

কিছুদিন একা একা বনে থেকে থেকে একটা প্রশ্নের চিরমীমাংসা হয়ে গেছে। তাঁর মনের মধ্যে দিয়ে খেলা করে গেছে হাজারটা স্মৃতি। শেষকালে তিনি বুঝতে পেরেছেন সত্যিই তাঁর মন কি চায়। ঘরে স্ত্রীর কাছে তিনি ফিরে চলেছিলেন। আর কোনদিন তাকে ছেড়ে যাবেন না।

কাঁধের ওপর একটি মৃত হরিণ আর মুখে বিজয়ীর চিহ্ন। তিনি এ কদিনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। বনে বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তাঁর জামাকাপড়। তবু তাঁর মনে ছিলো সুখ, মুখে ছিলো হাসি—তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রুকে পরাজিত করার হাসি।

এলেন এই হাসি দেখবে। তখন নিশ্চয় সে তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য অভিযোগ জানাবে না। সে বুঝতে পারবে এখন তো তিনি তার, এখন কেন চিরদিন, চিরকলে।

এই ভাবে আবার বাড়ির দিকে ফিরে চললেন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা। পিঠে বোঝা চাপিয়ে দুলতে দুলতে তিনি গান ধরলেন,

“আমার বাঘের মতো আধেকখানি
আধেক জলের জীব—”

গান গাইতে গাইতে বাড়ির কাছে এসে একেবারে থমকে গেলেন তিনি। কাঁধের ওপর থেকে খসে পড়ল হরিণ, বন্দুক লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে, ঠোঁটের মাঝেই ঝরে গেল গান। পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি। তাঁর মুখের ওপর ভেসে উঠলো এক কঠিন বেদনার ছায়া।



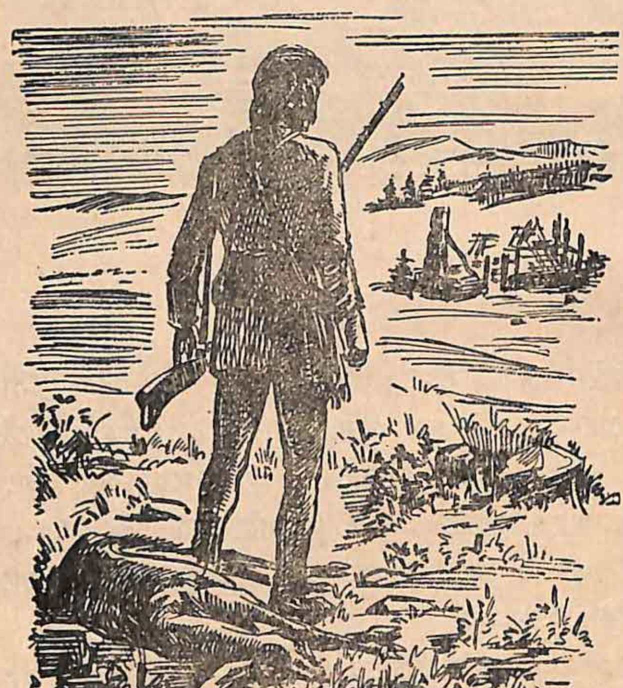
চার

একদিন সুখের সংসার ছিলো। সে ভিটে আজ ধুলোয় মিশে গেছে। ছাই-এর গাদা আর আধপোড়া কাঠের টুকরো এখানে ওখানে ছড়ানো। হাঁ করে অবাকচোখে তাকিয়ে আছে চুল্লীটা। এই ধ্বংসের সেই যেন একমাত্র সাক্ষী। ধুলোয় মিশে যাওয়া সেই ভিটের সামনে চোখে পড়ে একটি নূতন কবর।

নিজের অজান্তেই রিচার্ডের মনের মাঝে একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে ওঠে। সে ব্যথা এর আগে আর কোনদিন অনুভব করেন নি। কবরের বুকে কাঠের ক্রশ। তার বুকে লেখা একটি নাম। ঝুঁকে পড়ে নামটি পড়তে

থাকেন রিচার্ড। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। একটি নাম। টমাস মে।

পাগলের মতো আর একটি কবরের খোঁজ করতে থাকেন রিচার্ড। কিন্তু, মেলে না। সময় বয়ে চলে। আহত পশুর মতো ছাইয়ের গাদার চারপাশে ঘুরতে থাকেন রিচার্ড।



তারপর রওনা হলেন বুনের বাড়ির দিকে। বড় ক্লান্ত পা দুটি। ঝিমিয়ে পড়তে চায়। হৃদয় ব্যথায় ভরা।

কাঠের বেড়া পেরিয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলেন রিচার্ড। পুরুষেরা সরে দাঁড়ায়। পথ ছেড়ে দেয়। মেয়েরা আঁচলের খুঁটে চোখ মোছে। মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয় না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে শিশুর দল। মুখে ব্যথার কালো ছাপ। কেউ তাঁকে বাধা দেয় না। কেউ কোন কথা বলে না।

কি বলবে তারা? এ ঘটনা আগে তো তারা দেখেছে। ভবিষ্যতেও দেখবে। পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, দুর্গম পথ পেরিয়ে দূর দূরান্তর থেকে নতুন এই দেশে যারা এসেছে তাদের একটা মূল্য দিতে হবে বৈকি!

বুনের ঠিক মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালেন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা। অদ্ভুত এক প্রশ্ন ফুটে উঠেছিল তাঁর চোখের মাঝে। গলা শুকিয়ে গেছে। কোন স্বর বের হয় না। বুনও চুপচাপ থাকেন। ভাবেন, রিচার্ডই হয়তো আগে কথা বলবে। শেষকালে অবশ্য তাঁকেই বলতে হয়।

"আমি দুঃখিত রিচার্ড!"

"তাকে কি মেরে ফেলেছে?" ব্যথা-ভরা কণ্ঠে বলেন রিচার্ড, "অহেতুক সময় নষ্ট করবেন না। সে মরে গিয়ে থাকলে বলুন আমাকে।"

"না সে মরে যায়নি রিচার্ড।"

"ভগবানের দোহাই। কি হয়েছে আমায় সব খুলে বলুন বুন।"

"তাকে ধরে নিয়ে গেছে।"

চুপচাপ। একদৃষ্টে বুনের দিকে তাকিয়ে থাকেন রিচার্ড।

চোখের পাতা পড়তে চায় না। নিভে আসতে থাকে যেন দৃষ্টি।

"সেখানে আপনি উপস্থিত ছিলেন। আর আমার কাছে এই খবর দিচ্ছেন? আপনি আমার বন্ধু, তাই না? আপনার জন্যে আমি ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, বংশ সব কিছু ছেড়ে এই পাহাড়ী দেশে এসে আস্তানা গড়েছি। আপনার জন্যে আমি প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি—ডেনিয়েল বুনের নামের সঙ্গে এরকম একটা বিশ্বাস জড়ানো আছে। তারা তাকে ধরে নিয়ে গেল। আর আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। তাদের পিছু না নিয়ে চুল্লী কোলে আপনি আরাম করতে লাগলেন?" আর বলতে পারেন না রিচার্ড।

"আমি তাদের পিছু নিয়েছিলাম রিচার্ড।" আস্তে আস্তে বললেন বুন, "এখানে তো আরও লোক আছে। মেয়েরা, বাচ্চা। তাদের একলা ফেলে কি করে বেশিদূর যাই? তারা দলে ছিলো প্রচুর। এদের এভাবে ফেলে তাদের পিছু নেওয়া যায় না।"

"কারা সে সব ইণ্ডিয়ানরা?"

"একটি বিরাট দল—ওয়ানডট্, হুরণ, স্বানী আরও কতো কী! কি করব বলো রিচার্ড! তাকে কোথায় নিয়ে গেছে বুঝব কি ভাবে? তাছাড়া অতবড় দল না হলে তাদের আমরা ছেড়ে দিতাম না।"

একটু থেমে বুন আবার বলেন, "কিছু দিন অপেক্ষা করো রিচার্ড। তারা এই পথেই আবার ফিরে যাবে।

তখনই আমরা প্রতিশোধ নিতে পারব। কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত।"

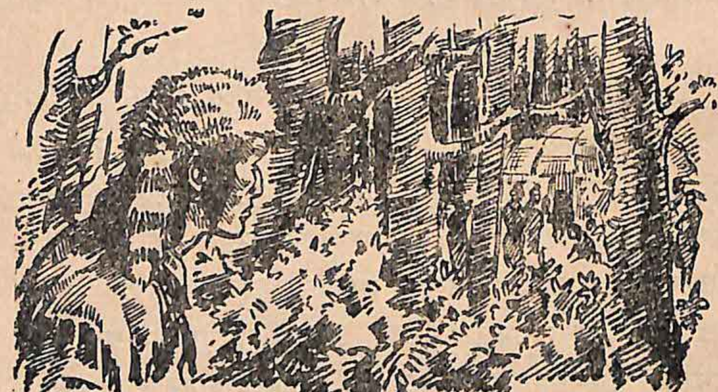
"আমার প্রতিশোধ হলো এই!" বলে রিচার্ড তাঁর বন্দুক হাতে তুলে নিলেন। "আমিও কারো সাহায্য চাইনে ডেনিয়েল। আমি একাই ছিলাম। একাই থাকতে চাই। এটাই হবে আমার প্রতিশোধ। ভগবান বাঁচান ইণ্ডিয়ানদের। তাদের অন্ততঃ মনে করে রাখতে হবে আমাকে। প্রিয় জিনিসকে ধ্বংস করা অতো সহজ নয়, এটা আমি বুঝিয়ে দিতে চাই।"

বুনের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রিচার্ড। তারপর গহণ অরণ্যের পথে শুরু হলো তাঁর যাত্রা।

সে সময়টি ছিল বড় ভয়াবহ। বিপদে ঘেরা। বিভৎস রূপ যুদ্ধের। ঘৃণা জেগেছে তাই। সারা পশ্চিম সীমান্তে ছড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধ। পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধের সঙ্গে এ-যুদ্ধের মিল নেই। অনেক, অনেক গুণ বিভৎস এ-যুদ্ধ। সেখানে মানুষেরা লড়েছে আদর্শের জন্য। আর এখানে রুটির জন্য। বৌ-ছেলে-মেয়ের জন্য। লাল চামড়ার মানুষ সাদা চামড়ার মানুষকে খুন করেছে। সাদা চামড়ার মানুষও একই রকম প্রতিশোধ নিয়েছে। কারণ হয়তো সামান্য। কিন্তু, প্রতিশোধ বিরাট। প্রতিশোধ আর প্রতিশোধ। অন্যায়ের শিক্ষা যেন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলেছে। সে-আগুন ছড়িয়ে পড়তো পূর্ব থেকে পশ্চিমে। তার সমাপ্তি ঘটত না। দেশের মাটি রক্তে লাল হয়ে না ওঠা পর্যন্ত।

পাঁচিলের বেড়া দিয়ে, সুন্দর সুন্দর ঘর বাড়ি বানিয়ে সুখে নিরাপদে একদিন যারা দিন কাটাতো, তাদের আস্তানা গড়তে হয়েছিল গহন বনে। সেখান থেকে তারা দেখতে পেত দাউ দাউ করে জ্বলছে তাদের ঘরবাড়ি। ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে চারদিক, পাহাড় সমান জমে উঠছে ছাইয়ের গাদা। কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে তবে মাঠে চাষ করতে হোত। শিকারে বের হলে অনেকেই ফিরে আসত না।

কে জানতো এর শেষ কবে? কবে এদেশে শান্তি ফিরে আসবে, নিরাপত্তা ফিরে আসবে?



স্ত্রীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা। দেশ থেকে দেশে খোঁজা শুরু হলো। পায়ে হেঁটে পাড়ি দিলেন হাজার হাজার মাইল পথ। বুনো পাখির মতো বড় হয়ে উঠলো মাথার চুল। জটে পাক লাগলো।

গায়ের তাঁতের কাপড় খসে গেল। উঠল গাছের ছালের বাকল।

উত্তরে ওজিবওয়েতে তার সন্ধান চললো। অদ্ভুত সে দেশ। মাটি অনুর্বর। গাছ বড় হতে পারে না। এতো নিস্তব্ধ, এতো নীরব যে নেকড়েও ডাকতে ভয় পায়। কুলকুল শব্দে বয়ে চলে নদী। ভূতের মতো কালো জল।

দক্ষিণে বিলক্সীতে খোঁজ করলেন। ফ্লোরোডা জলাভূমির চারপাশে তার খোঁজ করতে লাগলেন। কেমন যেন রহস্যে ঢাকা এই জলাভূমি। গা শিরশির করে।

এমন সব দেশ তিনি পেরিয়ে এলেন কোন সাদা চামড়ার মানুষ যা জীবনে দেখেনি। এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস তাঁর চোখে পড়লো, কোন সাদা চামড়ার মানুষ জীবনে যা কল্পনা করতে পারে না।

ব্যথায় ভরা তাঁর মন। মেপে ওজন করার মতো ব্যথা সে নয়। বুকের মাঝে সব সময় যেন একটা ধারালো ছুরির ফলক বিঁধছিল। এ ঘটনাকে তিনি ভুলে যেতে পারেন না। ভোলা যায় না। তাঁর চোখের সামনে যে বারবার ভেসে ওঠে একটি মুখ। এলেনের মুখ। টমাস মে-র একমাত্র মেয়ের মুখ।

উত্তর-দক্ষিণ-পুব-পশ্চিম সমস্ত দিকই ঘুরে এলেন তিনি। কিন্তু কোন সন্ধান মিললো না। এমনকি কেউ কিছুই বলতে পারলো না।

রাত্তিরটা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য যেখানেই তিনি গেছেন, যেখানেই কোন মেয়েছেলের গলার স্বর বা শিশুর কোলাহল

শুনতে পেয়েছেন সেখানেই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, "একটি লম্বা সুন্দর মেয়ে, নাম এলেন।"

তাঁর কথা শুনে ভ্রূ কুঁচকে গেছে সকলের। তাঁর নির্জনতা তাঁর ব্যথা অনুভব করেছে মনে মনে। এ ব্যথা তারা বোঝে। তাদের ছেলে-বউকে ঠিক এমনিভাবেই হারাতে হয়েছে। তারা জবাব দিয়েছে, "লম্বা সুন্দর মেয়ে অনেকেই তো আছে। তবে কেন্টাক থেকে এসেছে—কই, এমন তো মনে পড়ে না।"

ঠিক এমনিভাবেই আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা একজন খুনী হয়ে উঠলেন। সারা সীমান্ত জুড়ে মুখে মুখে ঘুরতে লাগলো রিচার্ডের নাম। ইণ্ডিয়ানদের তিনি খুন করলেন। কতো, তা সংখ্যায় গোণা কঠিন। ইণ্ডিয়ানদের কাছে ভীতিপ্রদ হয়ে উঠলো তাঁর নাম। এমনিভাবেই গভীর পাপ শুরু করলেন রিচার্ড। পাপ যতোই বাড়তে লাগল বুকের মাঝে ততোই খুনের চিহ্ন আঁকা হতে লাগলো। শান্তি কাকে বলে ভুলে গেলেন, বিশ্রাম ভুলে গেলেন। তাঁর জীবনের একমাত্র সঙ্গী হলো একটি লম্বা বন্দুক। কিন্তু, একটা বন্দুক কিংবা একটা ধারালো ছুরি তো তাঁর কাছে কিছুই নয়। তিনি যে একবার সংসারের আনন্দ পেয়েছেন।

পাপে-ভরা সে সব দিন। শান্তির কথা ছিলো দুর্বল। অত্যন্ত শিথিল।

দুর্বল হলেও একথা ছিলো জনি অ্যাপেলসীডের কথা। জনি অ্যাপেলসীড সম্পর্কে এবার কিছু জানা দরকার।

কিভাবে আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা তাঁর সংস্পর্শে এলেন সেই কথাই এবার বলবো।

অনেক বছর কেটে গেল। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন রিচার্ড। সীমান্তের এক পর্ণকুটিরে একদিন রাত্তির কাটাতে আশ্রয় নিলেন তিনি। সাদা চামড়ার মানুষের আগমন খুব কমই হোত এখানে। যারা আসত তারা তাই পেত জামাই আদর। আর তারা যদি পর্যটক হয়, অন্য দেশের খবর বয়ে আনে, তবে তো কথাই নেই।

স্নেহ যত্নে রিচার্ড হ্যামণ্ডকে তারা খাওয়ালো। খাওয়া দেখতে বেশ ভীড় জমে গেল। মেয়েরা তাঁর খাওয়া দেখে তারিফ করলো। বাচ্চারা ড্যাবাড্যাবা চোখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো। লম্বা চওড়া লোকটিকে দেখে একটু ভয় পেয়েই গিয়েছিল বাচ্চার দল। তবুও বিস্ময়ভরা চোখে তারা তাঁর বীরত্ব দেখছিল। বীর বলেই মনে করত তারা এইসব বন্য শিকারীদের।

কাঠের মাচায় ঘুমোতে গেল ছোটরা। জ্বলন্ত চুল্লীর পাশে বসে বড়দের কাছে অনেক গল্প বলতে লাগলেন রিচার্ড। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দেশবিদেশের গল্প শোনালেন তিনি। শেষকালে সেই একই প্রশ্নে ফিরে এলেন।

"তার নাম ছিল এলেন। খুব লম্বা আর দেখতে ভারি সুন্দর।"

"উঁহুঁ, এরকম কাউকে দেখেছি বলে তো ঠিক মনে পড়ে না!" ব্যথাতুর চিত্তে তারা মাথা নাড়লো।

তারা তো জানতো না এই একই প্রশ্নের জন্য রিচার্ড

হ্যামণ্ড কতো পথ পাড়ি দিয়েছেন। কতো হাজারবার যে একই প্রশ্ন তিনি করেছেন। কিন্তু, বরাবরই উত্তর এসেছে, "না।"

কিন্তু, এবারটি হলো ঠিক তার উল্টো। বাড়ির কর্তা ঠাকুরদার ঠাকুরদাকে বললেন, "এর একটা পথ তোমাকে আমি বলে দিতে পারি। একজন লোক আছেন। তিনি এসব জানেন। তোমার বৌ যদি সত্যিই বেঁচে থাকে, তবে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন তিনি।"

খুশিতে ঝলসে উঠল রিচার্ড হ্যামণ্ডের মুখ। এতদিনে খুশি হওয়ার মতো তিনি এই প্রথম একটি কথা শুনলেন। সামনে এগিয়ে যাওয়ার মতো একটি রাস্তা খুঁজে পেলেন।

"তিনি কে?" রিচার্ড জিজ্ঞেস করলেন।

"তিনি হলেন এমন একজন লোক যে সাদা চামড়া, লাল চামড়া, সকলের কাছেই শান্তির বাণী প্রচার করেন। তাঁকে আমরা বলি, জনি এ্যাপেলসীড।"

"কোথায় পাবো তাঁকে?"

"এটা অবশ্য ভাববার কথা। ভগবানই একমাত্র জানেন।" কর্তা বললেন, "হাজার হাজার মাইল ধরে তোমাকে খোঁজ করতে হবে। মাসখানেক আগে একটা রাত তিনি এখানে কাটিয়ে গিয়েছিলেন। আমার বাড়ির চারপাশে তখন এ্যাপেলের বীজ ছড়িয়ে গেছেন।"

"এ্যাপেলের বীজ ছড়িয়ে গেছেন?" ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন রিচার্ড।

"হ্যাঁ। এইটেই তাঁর কাজ। তিনি ধার্মিক। ধর্মের

কিছু ছোঁয়াচ নেই এরমধ্যে অবশ্য। কোন ধর্মের বই হাতে নিয়ে তিনি বেরোন না। সকলের কাছেই তিনি শান্তির বাণী পৌঁছে দেন। ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি তিনি যান। কেউ তাঁর গায়ে কোনদিন হাত তোলে না। শিশুর মতো ইণ্ডিয়ানরা তাঁর মনে স্থান করে নিয়েছে। তিনি এমন একজন লোক যাকে তুমি ঘৃণা করতে পারবে না কিছুতেই। শত চেষ্টা করেও।"

"কিন্তু এ্যাপেলের বীজ ছড়ানো," বিড়বিড় করে বলেন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা, "পাগলের কাজ ছাড়া আর কি !"

"পাগল তিনি নন। এটা তুমি ভালভাবেই জেনো।" বাড়ির গিন্নী একেবারে ফেটে পড়লো।

"পাগলের চেয়ে তিনি অনেক, অনেক দূরে। তাঁর মতো আর যদি কিছু লোক থাকতো, তাহলে পৃথিবীতে আর অশান্তি হতো না, এটা ঠিক।" কথা বলার সময় কর্তার চোখ ছুটি কেমন যেন ছলছল করতে লাগলো। ভক্তিতে, শ্রদ্ধায়।

"তাঁর দিক থেকে তিনি অবশ্য অদ্ভুত লোক।" গিন্নী আবার মুখ খুললেন, "তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান। আপেল বীজ ছড়ান—পাকা পাকা আপেল ফলে সারা দেশ যাতে একদিন ভরে উঠতে পারে। কতো বীজ যে তিনি ছড়িয়েছেন, তার কি আর কোন ঠিকঠিকানা আছে !"

"কিন্তু, আমার বৌকে তিনি দেখতে পাবেন কি করে ?" লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞাসা করেন রিচার্ড।

"ইণ্ডিয়ানদের এমন কিছু গোপনীয় নেই যা তাঁর

কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। শোনা যায়, তিনি নাকি পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ার সকলের সাথেই কথা বলেন।”

পরের দিন। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা যখন রওনা হচ্ছেন তখন গিন্নী তাঁর হাত ধরে বললেন, ‘জনি এ্যাপেল-সীডের খোঁজ করো রিচার্ড। মনে শান্তি পাওয়ার জন্যেও তাঁকে খোঁজ করো।”

এইভাবে স্ত্রীর অনুসন্ধান পরিণত হলো আর একটি মানুষের অনুসন্ধানে—জনি এ্যাপেলসীডের অনুসন্ধানে। এর পর থেকে রিচার্ড হ্যামণ্ড যেখানেই গেলেন, চলার পথে সেখানেই থামলেন, ঐ একটি কথাই শুধু বললেন। জনি এ্যাপেলসীডের কথা।

সকলেই প্রায় জনি এ্যাপেলসীডের কথা শুনেছে। বেশির ভাগ লোকই তাঁকে দেখেছে। কারণ, তিনি নিজেই তো একজন পর্যটক। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ান। এমন এক-জন লোকও মিললো না, যে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলে।

“হ্যাঁ, মাসখানেক আগে তিনি একবার এখানে এসেছিলেন।”

“হ্যাঁ, তিনি এখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। একবাটি দুধ আর একটা রুটি খেয়েছিলেন।

“হ্যাঁ, কিছুদিন আগে একবার এসেছিলেন। বাচ্চাদের সঙ্গে সারা সন্ধ্যেটা খেলা করেছিলেন। আমাদের একজোড়া জুতো দিয়ে গেছেন। জুতোটা নাকি তাঁকে বড় জ্বালাচ্ছিল। পা দু'টোকে যেন ছিঁড়ে দিচ্ছিল।”

"হ্যাঁ, তিনি এসেছিলেন, তবে চলে গিয়েছেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক এই জায়গায় তিনি বসেছিলেন যাওয়ার আগে তিনি বাড়ির চারধারে আপেলবীজ ছড়িয়ে গেছেন"

এইভাবে কথা শুনতে শুনতে এগিয়ে চললেন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা। যে পথ দিয়ে তিনি গিয়েছেন, সেই-পথ দেখিয়ে দিল সকলে। পশ্চিম দিককার পথ দেখিয়ে দিল তারা—সোজা গিয়ে সে পথ মিশেছে মিসিসিপির বনজঙ্গলে।

"এইটেই হলো তাঁর পথ।" তারা বুঝিয়ে দিল তাঁকে, "পড়ন্ত সূর্যের দিকে মাথা দিয়ে তিনি ঘুমিয়ে থাকেন। পশ্চিম দিকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পশ্চিম দিকেই সব সময় যান তিনি। বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান তিনি। তাঁর হাতের গাছের ফল আমরাই ভোগ করবো।"

জনি এ্যাপেলসীড সম্পর্কে অনেক কথাই শুনতে পেলেন রিচার্ড। কার কার মনে তিনি শান্তি এনে দিয়েছেন, কার কার জীবন রক্ষা করেছেন, কিভাবে আক্রমণকারীরা তাঁর মুখের একটা কথাতেই ফিরে গেছে, এমনি কতো সব কাহিনী।

তাঁর কথা শোনা এক জিনিস আর তাঁকে পাওয়া অন্য এক জিনিস। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। রিচার্ড বুঝতে পারলেন, তাঁর স্ত্রী বেঁচে নেই। জনি এ্যাপেলসীডকে পেলেও এর কোন কিনারা হবে না।

তবু তার খোঁজ করতে লাগলেন তিনি। কারণ, তাছাড়া

তো করার আর কিছুই নেই। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কি আর ভবিষ্যৎ আছে তাঁর।

এমনিভাবে চলতে চলতে মিসিসিপির পাড়ে একটা উঁচু টিবির ওপর চুপ করে এসে একদিন বসলেন রিচার্ড। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে নদী। আপন তালে, আপন মনে। সূর্য ডুবু-ডুবু। তার ম্লান আলোয় রক্তিম হয়ে উঠেছে রিচার্ডের মুখ। কাছেই ছোট ছোট দু'টো গাছ। নতুন পাতা গজিয়েছে, সাদা সাদা, ঠিক তুষারের মতো। কাছে গিয়ে দেখেন রিচার্ড একটি আপেলের গাছে ঝুলছে অজস্র পাকা পাকা আপেল।

নরম সবুজ ঘাসের বুকে বিশাল শরীরটাকে এলিয়ে দিলেন রিচার্ড। ক্লান্তিতে চোখ যেন জুড়ে আসতে চায়। হঠাৎ চোখে পড়ে বন ভেঙ্গে একটা লোক তাঁর দিকেই যেন এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, তাঁর দিকেই।

ঠাকুরদার ঠাকুরদার কাছে আসলেন ভদ্রলোক। জনি এ্যাপেলসীড। এরকম অদ্ভুত ভাবেই তিনি একদিন এসে হাজির হবেন, এ-কথা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা।

তাঁর গায়ে একটি ফতুয়া, মোটা কাপড়ের। কাঁধ পেঁচিয়ে একটা মোটা দড়ি হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো। ফতুয়ার বাইরে ঝুলছে দু'টো উলঙ্গ হাত। খালি গা, কোন জুতো নেই। মাথা খালি, টুপি নেই। হাত ফাঁকা, অস্ত্র নেই।

কাঁধে একটা ঝুলি, আপেলের বীজ ভরা। তখন বসন্ত-কাল, বীজ ছড়ানোর উপযুক্ত সময়। তাঁর বয়স যে খুব



বেশি তা নয়। মাথায় লম্বা লম্বা চুল, মুখে একগাল দাড়ি। রিচার্ডের মতো রোদে পুড়ে পুড়ে তাঁরও গায়ের রং কালচে হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, ঘন নীল।

তিনি সেখানে এসে দাঁড়াতেই রিচার্ডের অশান্তিতে-ভরা মনটা কেমন যেন শান্তিতে ভরে উঠলো। হঠাৎ। চকিতে। এ শান্তির স্বাদ আলাদা। আগে ঠিক পান নি। ফলভারে নত আপেল গাছের মতো, কুলকুল শব্দে বয়ে চলা নদীর মতো এ শান্তির যেন একটি আলাদা রূপ।

"কে আপনি ?" ঠাকুরদার ঠাকুরদা জিজ্ঞেস করলেন।

"সকলে আমাকে বলে জনি এ্যাপেলসীড।" নীল চোখ আর পুরু ঠোঁটের কোণে একটা হাসির ঝিলিক খেলে গেল। একটুখানি চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, "আমার কাছে একটুকরো রুটি আছে। বাসি রুটি অবশ্য। এই জঙ্গলে রুটি আর নুন বড় দুর্লভ জিনিস। একটুকরো রুটি যদি তুমি নাও তো আমি খুব খুশি হবো।

রিচার্ড হ্যামণ্ডের গা ঘেঁসে বসলেন জনী এ্যাপেলসীড, রুটিটাকে দুই ভাগ করে রিচার্ডকে দিলেন এক ভাগ। সব ঘৃণা, সব প্রতিশোধের ইচ্ছা যেন ধীরে ধীরে নিবে গেল রিচার্ড হ্যামণ্ডের মন থেকে। নির্ভয়ে একটি পাখি উড়ে এসে তাঁদের পাশে বসলো। তার মনে একেবারেই ভয় নেই, একেবারেই সন্দেহ নেই। নিজের রুটির টুকরো থেকে একটু ছিঁড়ে পাখির দিকে ছুঁড়ে দিলেন রিচার্ড। খুশিতে উপচে পড়ে রুটির টুকরোটি ঠোঁটে করে উড়ে গেল পাখিটি।

দুটি মানুষ। পাশাপাশি বসে থাকলেন। চুপচাপ। কোন কথা হলো না। সময় আপনমনে বয়ে চলল। তবু, যেন অনেক কথাই বলা হলো। নীরবে। চোখে চোখে। অনেকক্ষণ পরে রিচার্ড হ্যামণ্ড তার সেই নিজের কথা বললেন জনি এ্যাপেলসীডকে।

"ঘৃণায় তোমার মনটা একেবারে ছেয়ে গেছে!" জনি এ্যাপেলসীড বললেন।

"আমাকে ঠিক নিজের ছেলের মতো ভালবাসতেন তার বাবা। তাঁকে তারা খুন করেছে। বিনা কারণে কোন গভীর অন্ধকারে তারা এলেনকে নিয়ে গেছে।"



"কিন্তু তুমি তো একটা অমানুষ নও। তোমার শরীরে তো এখনও মানুষের রক্ত আছে।" আস্তে আস্তে বললেন জনি এ্যাপেলসীড।

"আমি খুন করেছি ঠিক। আমার মনটা যেন কেমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। ঠিক যেন পাথর হয়ে গেছে আমার মনটা। খুন করা ছাড়া কি আর উপায় আছে আমার বলুন!"

"সকলের মনই এরকম হয়। আমার কথা শোনো রিচার্ড। আমার মনও একদিন ঠিক ঐরকম ছিলো। ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে আমার মনেও ঘৃণা ছিলো। আমি তাদের পিছু নিয়েছি, খুন করেছি। আর দিনে দিনে পাপের বোঝা বাড়িয়ে তুলেছি। তারপর একদিন কঠিন এক তুষারপাতের মাঝে পড়ে গেলাম। পালাবার কোন পথ পেলাম না। অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকলাম পথে। তখন একজন ইণ্ডিয়ান এসে আমাকে তার বাড়ি নিয়ে গেল। আদর যত্নে শুশ্রূষা করল। আমি বেঁচে উঠলাম। তখন আমি দেখতে পেলাম, অন্য মানুষদের মতোন সেও একজন মানুষ। বুঝতে পারলাম, প্রত্যেক মানুষের মনেই ঘৃণা আর ভালবাসা পাশাপাশি জেগে থাকে।"

একটু থামলেন জনি। রিচার্ড হাঁ হয়ে শুনতে লাগলেন তাঁর কথা। তিনি আবার শুরু করলেন, "আরও অনেক কিছু যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমি দেখতে পেলাম একটি দেশ। সব জাতেরই মানুষ যেখানে ঠিক ভাইয়ের মতো পাশাপাশি বাস করবে। এ দেশ একদিন গড়ে উঠবে। ভগবানের সৃষ্টি নয়। মানুষের হাতে গড়া দেশ। মানুষই একদিন এখানে গড়ে তুলবে সুখী, শান্তিময় জীবন।

এইজন্যেই আমি বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াই। আপেলবীজ

ছড়াই। আগামীকালে যেসব মানুষেরা আসবে তারা এই সুমিষ্ট ফল ভোগ করবে। নিজেদের জীবনকে মধুময় করে তুলবে।"

"আপনার বেলায় হয়তো এটা হয়েছে।" রিচার্ড বললেন, "কিন্তু আমার মাত্র একটি জিনিসই ছিলো। আমার স্ত্রী। তাকেই আমি হারিয়েছি। নিজেকে আজ সব সময় নির্জন বলে মনে হয়। আমার মনটা একেবারে পাথর হয়ে গেছে!"

"আমার কথা তুমি শুনতে চাও রিচার্ড?"

"যা আপনি বলেন তাই শুনতে রাজী আছি।"

"তাহলে কেন্টাকের সেই সুন্দর দেশে ফিরে যাও। আগে যেখানে বাড়ি ছিলো সেখানে নতুন একটা বাড়ি বানাও। এই বীজগুলি নিয়ে যাও। বাড়ির চারপাশে এইগুলি ছড়িয়ে দিয়ো। তারপর সবুজ গাছে চারিদিক ঢেকে না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"

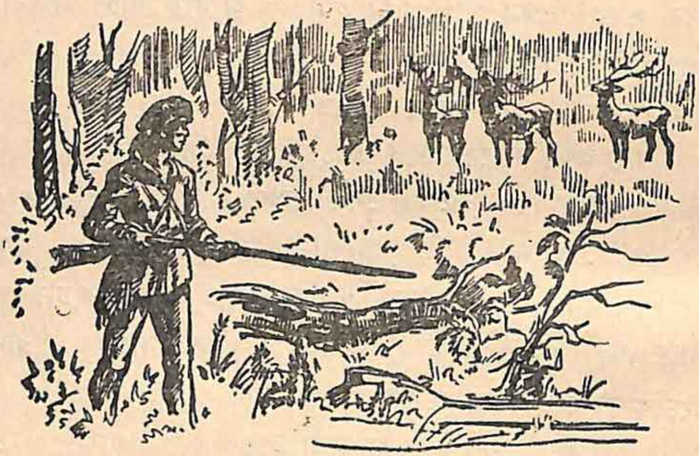
"একলা মানুষের পক্ষে বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানোই তো ভালো।" বললেন রিচার্ড।

"অনেক ঘুরে তো তুমি বেড়িয়েছো রিচার্ড। এখন বাড়ি ফিরে যাও।" কোমল কণ্ঠে বললেন জনি এ্যাপেলসীড।

হয়তো রিচার্ড হ্যামণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, হয়তো কেন্টাকের বনভূমি আর নরম মাটির জন্য তাঁর মন কেঁদে

উঠেছিল। পশ্চিম ফেরালেন তিনি হাজার হাজার মাইল পথ ধীরে ধীরে তাঁর পায়ের তলা থেকে সরে গেল।

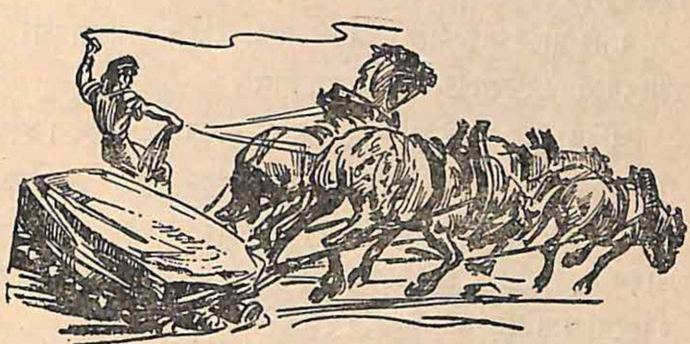
জনি এ্যাপেলসীডের কাছ থেকে বেশ কিছু বীজ নিয়ে ছিলেন রিচার্ড। কেন্টাকে যাওয়ার পথে পথে সে বীজ তিনি ছড়িয়ে দিলেন।



দীর্ঘকাল ধরে তাঁর যাত্রা চললো। শেষকালে বুনের বড়িতে এসে তিনি হাজির হলেন। লম্বা বন্দুকটাকে দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রেখে চুল্লীর ধারে বুনের পাশে গিয়ে বসলেন।

"আবার কি থাকবার জন্যে ফিরে এলে রিচার্ড?" বুন জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ, এবার থাকার জন্যেই ফিরে এলাম।" জবাব দিলেন রিচার্ড।



পাঁচ

নিজের হাতেই নিজের বাড়ি গড়ে তুলতে লাগলেন রিচার্ড হ্যামণ্ড। অদ্ভুত ধরণের বাড়ি। সে ধরণের বাড়ি আজ আর চোখে পড়ে না। বিরাট বিরাট গাছের গোড়ায় কুঠারের ঘা পড়লো। মাটিতে মাথা নত করলো গাছের সারি। সেই সব গুঁড়ি বয়ে আনা হাল। ঘরের খুঁটিতে পরিণত হোল। বড় বড় পাথরের চাঙ এলো। ঘোড়া লাগিয়ে টেনে আনা হলো। দেখতে দেখতে বিরাট এক ঘর উঠে গেল। এতোবড় ঘর যে একসঙ্গে কয়েকটা হরিণ রান্না করতেও বেগ পেতে হয় না।

বাড়ির সামনে দু'পাশে সেই আপেলের বীজগুলো ছড়িয়ে দিলেন রিচার্ড।

পাড়া প্রতিবেশীরা এসে জিজ্ঞেস করলো, "কি বুনছো হে?"

"জনি এ্যাপেলসীডের একটা ভিত্তি গড়ছি। আর কিছুই নয়।" হাসতে হাসতে জবাব দিলেন রিচার্ড।

মনের মাঝে এক অদ্ভুত আনন্দ বয়ে যেতে লাগলো তাঁর। চোখের ওপর ভেসে উঠলো শান্তির ছাপ।

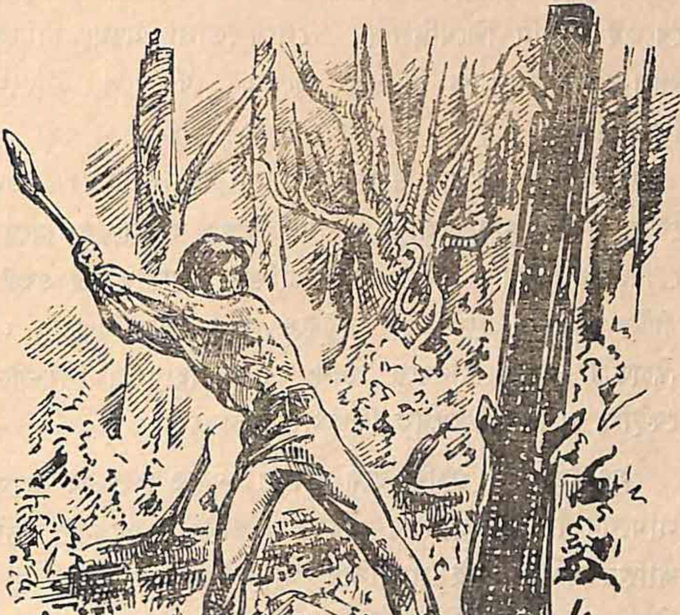
অধিকাংশ লোকই ভাবলো, এবার একেবারে ঘরকুনো হয়ে পড়েছে রিচার্ড। একটু কাণাঘুসোও সুরু হলো। কিন্তু, কোন বাধা দিলেন না আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা। ভাবছে ভাবুক। তিনি তো ভালভাবেই জানেন, আর যাই হোন, ঘরকুনো হয়ে পড়বেন না তিনি।

বুন এসে আবার বিয়ে করার জন্য অনুরোধ জানালেন তাঁকে। বুন জানতেন, এভাবে একা একা থাকলে জীবনে শান্তি পাওয়া যায় না।

রিচার্ড জবাব দিলেন, "আপেলের গাছ হোক আগে। তারপর ওসব ভাবা যাবে।" অপেক্ষা করতে লাগলেন রিচার্ড। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার মতো মানুষের পক্ষে এ কাজটি ছিলো এক অসহনীয় কাজ। তবু, তিনি অপেক্ষা করেছিলেন।

কেন, একটু ভালোভাবে ভাবলেই বোঝা যায়। কারণ তিনি যে ছিলেন একজন কাজের লোক। কাজ ছাড়া বাঁচতে পারেন না। যখন শিকার করে বেড়িয়েছেন, ভবঘুরের মতো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছেন। তখন

কাজটাই তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে। নিজের জ্ঞাতসারে না হলেও অজ্ঞাতে।



অনেকদিন কেটে গেল, তবু অপেক্ষা করতে লাগলেন রিচার্ড হ্যামণ্ড। মন টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক কিছুই তাঁর চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে গেল। কিন্তু, তিনি কাজে মেতে থাকলেন। বাড়ি তৈরি করাই তাঁর কাজ। কার জন্যে, তা অবশ্য জানেন না।

প্রায়ই শিকারে বার হতে লাগলেন রিচার্ড। সুন্দর

ভাবে, নিপুনভাবে পশুদের চামড়া ছাড়িয়ে নিলেন। এরকম ভাবে চামড়া ছাড়ানো রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকেই তিনি শিখেছিলেন। লোম-তোলা নরম চামড়া গুলি তিনি মেঝেতে বিছিয়ে দিতেন, দেওয়ালে টাঙিয়ে দিতেন।

ঠাকুরদার ঠাকুরদা ভালো কারিগর ছিলেন না। তবু কোন রকমে ছুরি আর কুঠার দিয়ে ব্যবহারের মতো টেবিল-বেঞ্চ-চেয়ার বানালেন। রাত্তিরে শোয়ার জন্য একটা খাটিয়াও তৈরি হলো। একটুকুও মাংস মুখে দিতেন না রিচার্ড। তার বিনিময়ে তিনি সব লোহার জিনিস-পত্র কেট্‌লি, থালা, ঘটি অনেক কিছু সংগ্রহ করলেন।

সব জিনিসই তৈরি হয়ে গেল। তবুও অপেক্ষা করতে লাগলেন রিচার্ড হ্যামণ্ড। কবে তিনি আসবেন, সেই শান্তির দূত। সেই সাদাসিধে মানুষটি। ছড়ানো বীজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সময় কেটে যেতে লাগলো রিচার্ডের। কবে সেই বীজে অঙ্কুর হবে, সবুজ পাতা গজাবে। তার পর সত্যি সত্যি একদিন সেই বীজ থেকে অঙ্কুর বেরুলো। সাদা তুষারের মতো। রিচার্ডের কেবলি মনে হতে লাগলো, একদিন এই গভীর বন আর থাকবে না। শুধু থাকবে এই সুমিষ্ট, সুস্বাদু ফলের গাছ।

তখন তাঁর চোখের সামনে যে ভেসে উঠেছে সভ্যতার ছবি। সুখে-শান্তিতে পাশাপাশি সব মানুষেরা বাস করে, তাদের চার ধারে আপেল গাছ। পাকা পাকা আপেলে ভরা। জনি এ্যাপেলসীডের বীজ থেকেই এইসব গাছের জন্ম।

রিচার্ডের জীবনে এইটাই বোধ হয় সবচেয়ে মূল্যবান সময় ছিলো। ঘৃণা বোধ হয় মন থেকে একেবারেই মুছে গিয়েছিল।

তারপর দেখতে দেখতে একদিন এলো। অঙ্কুর থেকে চারা বেরুলো। ছোট ছোট চারা, সবুজ। ঠিক সবুজ ঘাসের মতো। খুব আরামের ঘুম হোল সেই রাত্রে রিচার্ডের।

অপেক্ষা করা এরপর থেকে যেন আরও কঠিন হয়ে উঠলো। দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে। দেখতে দেখতে গ্রীষ্ম এসে পড়লো। নিজের হাতে ফলানো শস্য ঘরে তুললেন। গম ভেঙ্গে আটা বানালেন। বন থেকে থলে ভর্তি করে করে বাদাম কুড়িয়ে আনলেন।

সারা কেন্টাকে এমন একটা বাড়ি ছিলো না যা রিচার্ড হ্যামণ্ডের বাড়ির মতোন এতো সুন্দর, এতো গোছানো।

তারপর এক সন্ধ্যেবেলা। কাজকর্ম সারা হয়ে গেছে বাইরের বারন্দায় বসে আছেন রিচার্ড। হঠাৎ নজরে পড়লো বনের পথ বেয়ে ছুটি লোক এদিকে এগিয়ে আসছে এক ভদ্রলোক আর একজন মহিলা। ভদ্রলোকের গাল-ভরা দাড়ি। গায়ে একটা ফতুয়া। কাঁধে ঝুলি। আর তাঁর কোলে একটি শিশু। ফুটফুটে শিশু।

সাদা চামড়া আর লাল চামড়ার মানুষেরা আজ যখন পাশাপাশি বাস করছে, পুরোনো কথা সব তারা তখন

ভুলে গেছে। জনি এ্যাপেলসীড কিভাবে যে আমার ঠাকুরদার ঠাকুরমার সন্ধান পেলেন, সেকথা বলা কঠিন। সন্ধান পেয়েছিলেন এটাই তো বড় কথা। হয়তো পাখি-রাই তাঁকে বলে দিয়েছিল। এই পাখিরাই তো একদিন তাঁকে আপেলের বীজ এনে দিয়েছিল। আগামী কালের মানুষদের জন্য। সুখ আর শান্তির জন্য।

স্বামী আর স্ত্রী। কতো দিন পরে দেখা। কতো ঝড়-ঝাপ্টা পেরিয়ে আবার একসঙ্গে মেলা। কতো কথা যেন বাকী। সে-কথার শেষ নেই। দু'জনের কথা শুরু হলো। শেষ হতে চায় না একেবারে। আর জনি এ্যাপেল-সীড রিচার্ডের বাচ্চাটাকে নিয়ে আপন মনে খেলা করতে লাগলেন। বয়সের তফাৎ আছে ঠিক, কিন্তু, মনের দিক থেকে দু'জনেই শিশু।

জনি এ্যাপেলসীডকে একটা ধন্যবাদ দেওয়া, অতো সহজ ছিলো না তাঁদের কাছে। তাঁরা কোন ভাষাই খুঁজে পেলেন না। তাঁরা আবার ছিলেন এমন মানুষ কাজের মধ্য দিয়ে সব কিছু দেখাতে চান। কথার মধ্য দিয়ে নয়। তাঁরা জানতেন, যে-ঋণের বোঝা জনি এ্যাপেলসীড আজ তাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন তা আর শোধ দেওয়া যাবেনা কোনদিন। শোধ দেওয়া যায় না।

অন্ততঃ রাত্তিরটা কাটিয়ে যাওয়ার জন্য জনি এ্যাপেল-সীডকে অনুরোধ জানালেন তারা।

কিন্তু মাথা নাড়লেন তিনি। বললেন "অনেক বীজ

ছড়ানো যে এখনও বাকী আছে। আরও সুদিন আসছে, মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে পশ্চিম পানে এগোচ্ছে।

বীজের ঝোলাটা তারপর তিনি কাঁধে তুলে নিলেন। মৃদু হেসে বেরিয়ে পড়লেন তার পথে। রিচার্ড আর



এলেন সজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তাঁর দিকে যতোক্ষণ না পর্যন্ত তিনি অজানায় মিলিয়ে যান। তার

পর ধীরে ধীরে অজানায় মিলিয়ে গেলেন জনি এ্যাপেলসীড চিরদিনের জন্য। চিরকালের জন্য।

এইজন্যই তো আমি যখন আপেল খাই, তখন তার কিছু বীজ বাঁচিয়ে রাখি। আমার বাবাও ঠিক একই জিনিস করতেন। তাঁর বাবা, তাঁর বাবা, তাঁর বাবার বাবাও ঠিক একই জিনিস করেছেন। চৈত্রের শেষে কিংবা বৈশাখের শুরুতে এ বীজগুলো আমরা ছড়িয়ে দিই।

কাজটা এমন কিছুই শক্ত নয়। ইচ্ছে করলে যে-কেউ করতে পারে। অতি সহজেই করতে পারে। কোনসময় হয়তো বীজ থেকে চারা গজাবে, কোনসময় হয়তো গজাবে না। কিন্তু, গজাক আর নাই গজাক, এই বীজ ছড়ানোর মানেই হলো জনি এ্যাপেলসীডের একটা ভিত্তি স্থাপন করা।